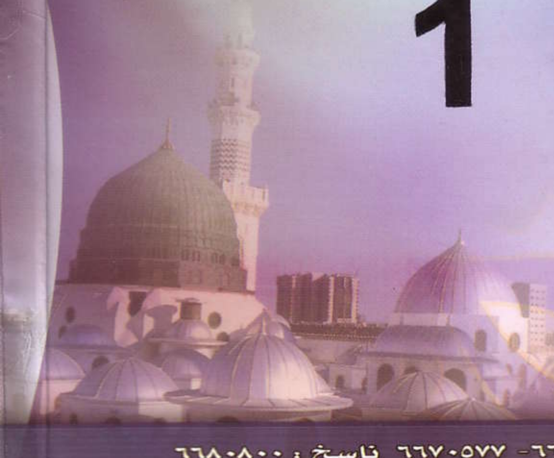
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

بمحافظة راس تنورة

পাঠ্যসূচী

1



هاتف : ٦٦٧٠٥٢٠ -٦٦٧٠٥٧٧ ناسخ : ٦٦٨٠٨٠٠

لدعم المكتب على حساب ٦٦٦٦/٩ -٦١٠٠/٩ -٩٤/٠

بسم الله الرحمن الرحيم

المنهج التعليمي

الجزء الأول–الطبعة الثانية

تشرف بإعداده وترجمته:

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

السعودية – الزلفي ١١٩٣٢ – ص.ب: ١٨٢

ت: ٠٦٤٢٢٥٦٥٧ – فاكس: ٤٢٢٤٢٣٤

পাঠ্যসূচী

প্রথম খন্ড-দ্বিতীয় প্রকাশ

লিখনে ও অনুবাদেঃ

মক্তব তাওয়িয়াতুল জালিয়াত জুলফী

সাউদি আরব- পিটার বাক্স নং ১৮২ আজ্জুলফী ১১৯৩২

টেলিফোন নং ০৬৪২২৫৬৫৭- ফ্যাক্স নং ৪২২৪২৩৪

সূচীপত্র

المقدمة

ভূমিকা

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

আমরা জুলফি জালিয়াত অফিস কর্তৃক এই পাঠ্যসূচী সকলের সামনে পেশ করতে পেরে নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি। আর মহান আল্লাহর নিকট আশা করছি যে, তিনি এটাকে সকলের জন্য উপকারী বানিয়ে দেবেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই মনোনীত করে নেবেন।

আমরা এই পাঠ্যসূচীকে অতি সহজ-সরল এবং সংক্ষিপ্তকারে পেশ করতে প্রচেষ্টা করেছি। এতে বিদ্যমান যাবতীয় বিষয় খুবই সহজ পদ্ধতিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

আশা করছি অন্যান্য জালিয়াত অফিস ও ইসলামী সংস্থার কর্তৃপক্ষ এবং যাঁরা অন্যদের (ধর্মীয়) শিক্ষা দেওয়ার প্রতি আগ্রহী, তারা তাঁদের উদ্দেশ্যের বিষয় বস্তু এর মধ্যে পাবেন।

أصول العقيدة

আক্বীদার মৌলিক বিষয়সমূহ

তাওহীদ ও উহার প্রকারভেদ

আল্লাহর জন্যই তাঁর গুণাবলী স্বীকার ও বিশ্বাস করা এবং সর্ব প্রকারের এবাদত একমাত্র তাঁর জন্য করার নাম হচ্ছে তাওহীদ। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

অর্থাৎ, "আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবল আমার এবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি"। (৫১: ৫৬) তিনি আরো বলেন,

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

অর্থাৎ, আল্লাহরই এবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন শরীক স্থাপন করো না"। (৪:৩৬)

তাওহীদ তিন প্রকার যথা,

১। তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ

২। তাওহীদে উলুহিয়্যাহ

৩। তাওহীদে আসমা অসসিফাত।

প্রথমতঃ তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ তথা প্রতিপালকের একত্ববাদ হলো,

আল্লাহকে একক স্রষ্টা, সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী ও পরিচালক বলে বিশ্বাস করা।তিনিই আহারদাতা, জীবন ও মৃত্যুর মালিক। আকাশমন্ডল ও যমীনের বাদশাহী তাঁরই জন্য। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ فاطر ٣

অর্থাৎ, "আল্লাহ ছাড়া কি কোন সৃষ্টিকর্তা আছে, যে তোমাদেরকে আকাশ এবং যমীন থেকে রিযিক দান করে? তিনি ছাড়া কোন সত্যিকার মাবুদ নেই"। (৩৫: ৩) তিনি আরো বলেন,

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ الملك١

অর্থাৎ, "অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ সেই সত্তা, যাঁর মুঠির মধ্যে রয়েছে (সমগ্র সৃষ্টিলোকের) কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্ব। প্রত্যেকটি জিনিসের উপর তাঁরই কর্তৃত্ব সংস্থাপিত"। (৬৭: ১) অনুরূপ আল্লাহ পাকই একমাত্র পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক। তিনিই তাঁর সৃষ্টিকে পরিচালিত করে থাকেন। যেমন তিনি বলেন, "শুনে রেখো, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। তিনি বরকতময়, বিশ্বজগতের প্রতিপালক"। (৭:৫৪) আর তাঁর এই রাজত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। পৃথিবীর কোন জিনিস এর আওতা বহির্ভূত নয়। খুব কম সংখ্যক মানুষই এই তাওহীদকে অস্বীকার করেছে। আবার এরা মৌখিকভাবে অস্বীকার করলেও এদের অন্তর এর স্বীকৃতি দিয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, "তারা সরাসরি যুলুম ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে এই নিদর্শনগুলি অস্বীকার করল, অথচ তাদের দিল এগুলিকে মেনে নিয়েছিল"। (২৭: ১৪)

দ্বিতীয়তঃ তাওহীদে উলুহিয়্যা তথা মাবুদের একত্ববাদ হলো,

সকল প্রকারের এবাদতের অধিকারী একমাত্র আল্লাহকেই মনে করা। অর্থাৎ, মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার এবাদত করবে না, চেষ্টা করবে না নৈকট্য লাভের। আর এ প্রকারের তাওহীদের বাস্তবায়নের জন্যই আল্লাহ জ্বিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

অর্থাৎ, "আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবল আমার এবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি"। (৫১: ৫৬) আর এই একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করার জনাই রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন, অবতীর্ন হয়েছে আসমানী সমূহ কিতাব। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (الأنبياء٢٥)

অর্থাৎ, " আমরা তোমার পূর্বে যে রাসূলই পাঠিয়েছি, তাঁকে এই অহীই দিয়েছি যে, আমি ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই; অতএব তোমরা আমারই দাসত্ব কর"। (২১: ২৫) আর এই তাওহীদকেই মুশরীকারা অস্বীকার করেছিল, যখন তাদেরকে রাসূলগণ এর প্রতি আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। তাদের বক্তব্য ছিল, " তুমি আমাদের নিকট কি এই জন্য এসেছ যে, আমরা কেবল আল্লারই দসত্ব করি, আর আমাদের বাপ-দাদারা যাদের বন্দেগী করে এসেছে, তাদেরকে পরিহার করি"? (৭: ৭০) এ কথা পরিস্কার যে, এবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তার জন্য করা যাবে না। তাতে সে সত্তা নবী হোক, কিংবা ফেরেশতা, অথবা কোন নেক ওয়ালী বা যে কোন সৃষ্টি হোক না কেন। কারণ এবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা জায়েয নয়।

তৃতীয়তঃ তাওহীদে আসমা অসসিফাত তথা নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদ হলো,

আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে নিজের যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী উল্লেখ করেছেন, অথবা তাঁর রাসূল বিশুদ্ধ হাদীসে আল্লাহর যে সমস্ত গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, সেগুলো যথার্থভাবে মেনে নেওয়া। এর মধ্যে কোন ধরনের বিকৃতি, অস্বীকৃতি, ধরন বা প্রকৃতি নির্ণয় অথবা সাদৃশ্য পেশ না করা। সুতরাং আল্লাহ যে নামে নিজেকে আখ্যায়িত করেছেন তার উপর প্রকৃতার্থে ঈমান আনা অত্যাবশ্যক, রূপকার্থে নয়। যেমন, আল্লাহ নিজেকে (الحي القيوم) তথা চিরঞ্জীব ও সব কিছুর ধারক বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, (حي) তথা চিরঞ্জীব আল্লাহর একটি নাম বিশেষ। আর এই নাম আল্লাহর যে গুণটি প্রকাশ করছে তার প্রতিও ঈমান রাখতে হবে। আর সে গুন হচ্ছে, পরিপূর্ন জীবন, যার নেই আদি ও অন্ত। অনুরূপ আল্লাহ নিজেকে (سميع) বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আমাদের ঈমান রাখতে হবে যে, (سميع) আল্লাহর একটি নাম বিশেষ। এর অর্থ হচ্ছে সর্বশ্রোতা। আর 'শুনা' আল্লাহর একটি গুণ- এর প্রতিও আমাদেরকে ঈমান আনতে হবে।

অন্য একটি উদাহরণ,

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ المائدة ٧٤

অর্থাৎ, "ইয়াহুদীরা বলে, আল্লাহর হস্তদ্বয় বাঁধা রয়েছে। বাঁধা হয়েছে তাদেরই হাত এবং তাদের এই সব প্রলাপোক্তির কারণে তাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। আল্লাহর হস্তদ্বয় তো উদার উন্মুক্ত, তিনি যেভাবেই ইচ্ছা ব্যয় করেন"। (৫: ৬৪) এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক নিজের দু'টি উন্মুক্ত ও উদার হস্তের কথা বর্ণনা করেছেন। তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহর দু'টি হস্ত আছে, যা দান ও অনুগ্রহের জন্য প্রসারিত, উন্মুক্ত ও উদার। কিন্তু আল্লাহর পবিত্র হস্তদ্বয়ের ধরন বা প্রকৃতি নিয়ে অন্তরে কোন কল্পনা না করা, মুখেও তা প্রকাশ বা ব্যক্ত না করা, অনুরূপ সৃষ্টির হাতের সাথে কোন প্রকার সাদৃশ্য বা তুলনা না করা আমাদের উপর ওয়াজিব। কারন মহান আল্লাহ বলেন, "বিশ্বলোকের কোন জিনিসই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন"। (৪২: ১১)

সারমর্ম হচ্ছে যে, আল্লাহ নিজের যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী উল্লেখ করেছেন বা তাঁর রাসূল যে সব নাম ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, কোন ধরনের বিকৃতি, সাদৃশ্য, ধরন-গঠন নির্ণয় না করে, বা অস্বীকৃতির পন্থা অবলম্বন না করে প্রকৃতার্থে তা মেনে নেওয়া।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর অর্থ ও মাহাত্ম্য

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিই দ্বীনের ভিত্তি ও বুনিয়াদ। ইসলাম ধর্মে এর রয়েছে বড় মর্যাদা ও মহান তাৎপর্য। এটি ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মৌলিক বুনিয়াদসমূহের সর্ব প্রথম বুনিয়াদ এবং ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা। সমূহ সৎকার্য আল্লাহর দরবারে গৃহীত হওয়া না হওয়া এ কালেমার মৌখিক স্বীকৃতি দেওয়া এবং তদনুযায়ী আমল করার উপর নির্ভর করে। এ বাক্যটির সঠিক ও বিশুদ্ধ অর্থ যার দ্বিতীয় কোন ব্যাখ্যার অবকাশ নেই তা হলো, "আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই"। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা নেই, অথবা আল্লাহ ছাড়া আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সক্ষম কেউ নেই, বা আল্লাহ ব্যতীত কেউ বিদ্যমান নেই।

এ বাক্যটির দু'টি অংশ রয়েছে। যথা,

১। 'লা-ইলাহা' এটি নেতিবাচক বা অস্বীকৃতিমূলক অংশ। এতে প্রত্যেক বস্তুর উপাস্য বা মা'বুদ হওয়ার যোগ্যতাকে অস্বীকার করা হয়েছে।

২। 'ইল্লাল্লাহ' এটি ইতিবাচক অংশ। যাতে শুধুমাত্র এক ও এককভাবে আল্লাহর জন্যই মা'বুদ হওয়ার উপযুক্ততাকে দৃঢ়ভাবে স্বীকার করা হয়েছে। যার নেই কোন শরীক ও অংশীদার। অতএব আল্লাহ ব্যতীত কারো এবাদত করা যাবে না। কোন প্রকারের এবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য সম্পাদন করা বৈধ হবে না। যে ব্যক্তি এ কালেমার অর্থ অনুধাবন করে এবং তার অত্যাবশ্যকীয় বিধানগুলো সর্ব প্রকার শির্ক থেকে বিরত থেকে, একত্ববাদের স্বীকৃতি দিয়ে মেনে চলে, মুখে তার স্বীকৃতি দেয়, সাথে সাথে কালেমায় নিহিত বিষয়গুলোর উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয় রেখে তদনুযায়ী আমল করে, সেই প্রকৃত মুসলমান। আর যে অবিচল কোন আস্থা না রেখে তার উপর আমল করার ভান দেখায়, সে মুনাফিক ও কপট। আর যে কালেমার পরিপন্থী (যথা শির্ক) কাজ করে, সে মুশরিক ও কাফের যদিও সে তা মুখে উচ্চারণ করুক না কেন।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য

এ কালেমার অনেক উচ্চ মর্যাদা ও মাহাত্ম্য এবং বিপুল সুফল রয়েছে। নিম্নে কিঞ্চিৎ পেশ করা হলো।

১। এ কালেমাটি দোযখের চিরস্থায়ী ও অনন্ত কালের ভয়াবহ শাস্তি থেকে মানুষকে নিষ্কৃতি দেয়, যদিও (গোনাহের কারণে সে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য) তাতে নিক্ষিপ্ত হয়। মুসলিম ও বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীসটি তারই প্রমাণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

(يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ
بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ)

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তার অন্তরে যব পরিমাণ কল্যাণ আছে, তাকে দোযখ থেকে বের করে আনা হবে। আর যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর উচ্চারণ করেছে এবং তার অন্তরে গম পরিমাণ কল্যাণ আছে, তাকে দোযখ থেকে বের করে আনা হবে। আর সে ব্যক্তিকেও বের করে আনা হবে, যে এ বাক্যটি পড়েছে এবং তার অন্তরে অণু পরিমান কল্যাণ আছে"। (বুখারী)

২। এ কালেমাটির জন্য মানুষ ও জ্বিন জাতিদ্বয়কে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নাই কেবল এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার এবাদত করবে"। (৫১ঃ ৫৬)

৩। এ কালেমাটির প্রচারের জনাই যুগে যুগে রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, অবতীর্ণ হয়েছে আসমানী সমূহ কিতাব। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ الأنبياء ٢٥

অর্থাৎ, "আমরা তোমার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ অহী দান করেছি যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই; অতএব তোমরা আমারই এবাদত কর"। (২১ঃ ২৫)

৪। এ কালেমাটি সমস্ত রাসূলগণের দাওয়াতের এক অভিন্ন বিষয় ছিল। তাঁরা সকলেই এর দিকে আহ্বান করে স্বীয় জাতিকে বলতেন, "আল্লাহর এবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বুদ নেই" (৭ঃ ৭৩)

৫। এ কালেমাটি হলো সর্বোত্তম যিকর। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ সর্বোত্তম যে যিকরটি করতাম সেটি হলো,

(لا إله إلا الله وحده لا شريك له)

অর্থাৎ, "আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই"। (মুআত্তা)

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর শর্তাবলী

আমরা যে কালেমাটি মুখে উচ্চারন করে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে সমবেত হয়েছি, সে কালেমার এমন কিছু শর্তাবলী আছে, যা একত্রে আমাদের মধ্যে বর্তমান হলে এবং একটি শর্তেরও বিরোধিতা না করে এসব-গুলো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে পারলে প্রকৃত মুমিন বলে পরিগণিত হবো। নিম্নে সে শর্তাবলী সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করা হলো,

১। ইলম, (জ্ঞান)। কালেমার ইতিবাচক ও নেতিবাচক অর্থ এবং তার অবিচ্ছেদ্য অংশের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বান্দা যখন মহান প্রভুকে এক ও একক মা'বুদ বলে জানবে, তিনি ব্যতিরেকে অন্য যে কোন সত্তার এবাদত করাকে ভ্রান্তি বলে বিশ্বাস করবে, এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করবে, সেই প্রকৃতার্থে কালেমার মর্ম ও তাৎপর্যের খাঁটি জ্ঞানী বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾ محمد ١٩

অর্থাৎ, "হে নবী! জেনে রেখো! আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই"। (৪৭ঃ ১৯) রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

((من مات وهو يعلم أنه لاإله إلا الله دخل الجنة)) مسلم

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই-এর জ্ঞান রেখেই মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (মুসলিম)

২। দৃঢ় বিশ্বাস। এ কালেমার মৌখিক স্বীকৃতি এমন দৃঢ় বিশ্বাস ও অবিচল প্রত্যয় সহকারে দিতে হবে যাতে থাকবে অন্তরের প্রশান্তি। জ্বিন ও মানব শয়তানদের বপন করা কোন প্রকারের সন্দেহের বীজ সেখানে থাকবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ الحجرات ١٥

অর্থাৎ, "প্রকৃত পক্ষে মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। অতঃপর কোন সন্দেহ পোষণ করে না"। (৪৯: ১৫) আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

(أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ لاَ يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ)

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার মা'বুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যে কোন বান্দা এ দু'টি বাক্যের সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (মুসলিম)

৩। গ্রহণ। এ কালেমার প্রত্যেকটি দাবীকে মুখে ও অন্তরে সাদরে গ্রহন করতে হবে। অতএব অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন ঘটনাবলী যার উল্লেখ কুরআন ও হাদীসে এসেছে, তা বিশ্বাস করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধভাবে যা বর্ণিত হয়েছে, তার প্রতি ঈমান আনতঃ প্রত্যেকটিকে গ্রহণ করে নিতে হবে। কোন কিছুকেই প্রত্যাখান করা যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ البقرة ٢٨٥

অর্থাৎ, "রাসূল সেই হেদায়াতকেই বিশ্বাস করেছেন, যা তাঁর পরোয়ারদিগারের নিকট হতে তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে। আর যারা এই রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করেছে তারাও সেই হেদায়েতকে মন দিয়ে মেনে নিয়েছে। সকলেই আল্লাহ, ফেরেশতা, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে ও মানে এবং তাদের কথা এই, আমরা আল্লাহর রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আমরা নির্দেশ শুনেছি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছি। হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট গুনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করি, আমাদেরকে তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে"। (২ঃ ২৮৫)

শরীয়তের কোন বিধান বা তার নির্ধারিত শাস্তি ও দন্ডবিধির উপর আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপন করা, বা তা প্রত্যাখান করা ঈমানের সমস্ত দাবীকে গ্রহন না করারই শামিল। যেমন কেউ কেউ চুরি ও ব্যভিচারের দন্ড-বিধি, বহুবিবাহ প্রথা ও উত্তরাধিকার বিধি-বিধান প্রভৃতির উপর চরম ধৃষ্টতার সাথে তথাকথিত অসার অভিযোগ খাড়া করে থাকে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ الأحزاب ٣٦

অর্থাৎ, "কোন মুমিন পুরুষ ও কোন মুমিন স্ত্রীলোকের এই অধিকার নাই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন

কোন বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন, তখন সে নিজের সেই ব্যাপারে নিজে কোন ফয়সালা করবার ইখতিয়ার রাখবে"। (৩৩ঃ ৩৬)

৪। আনুগত্য। এর অর্থ, মেনে নেওয়া ও আনুগত্য করা। অর্থাৎ, কালেমা যে সমস্ত বিষয়কে আরোপ করে, তা মেনে চলা। আনুগত্য ও গ্রহণের মধ্যে পার্থক্য এই যে, গ্রহণ হলো কালেমার ব্যাপক অর্থের বিশুদ্ধতার মৌখিক স্বীকৃতি দেওয়া। আর আনুগত্য হলো, কর্মের মাধ্যমে তার অনুসরণ করা। তাই কেউ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ বুঝলো, এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং মৌখিক স্বীকৃতিও দিলো, কিন্তু সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না, করলো না আনুগত্য ও অনুসরণ, এমতাবস্থায় তার সেই জ্ঞান, বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি তার কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ الزمر ٥٤

অর্থাৎ, "ফিরে এসো তোমাদের রবের দিকে এবং অনুগত হও তাঁর"। (৩৯ঃ ৫৪) আল্লাহ পাক আরো বলেন,

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ النساء ٦٥

অর্থাৎ, "হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কিছুতে মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের বিষয় ও ব্যাপারসমূহে তোমাকে বিচারপতিরূপে মেনে নেবে। অতঃপর তুমি যাই ফায়সালা করবে, তারা নিজেদের মনে তৎসম্পর্কে কোন কুণ্ঠাবোধ করবে না বরং তা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেবে"। (৪ঃ ৬৫)

৫। সত্যনিষ্ঠা। সে নিজের ঈমান ও মৌখিক ধর্মবিশ্বাসে সত্যবাদী হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ التوبة ١١٩

অর্থাৎ, "হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যাদর্শ লোকদের সংগী হও"। (৯ঃ ১১৯) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

(من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة ﴾ رواه أحمد

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি অন্তর থেকে সত্যনিষ্ঠা সহকারে "লা-ইলাহা ইল্লাহ" বললো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (মুসনাদে আহমদ) কেউ যদি এ কালেমাটির মৌখিক স্বীকৃতি দেয় আর অন্তরে তার দাবীকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করে, তাহলে তার মৌখিক স্বীকৃতি তাকে মুক্তি দিতে পারবে না। বরং সে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত বিষয়কে বা তার কোন কিছুকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সত্যনিষ্ঠার পরিপন্থী বস্তু। কেননা, আল্লাহতা'য়ালা নিজের আনুগত্যের নির্দেশ প্রদানের সঙ্গে রাসূলের আনুগত্য ও তাঁর সত্যায়ন করাকে সংযুক্ত করেছেন। যেমন, তিনি বলেন,

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ النور ٥٤

অর্থাৎ, " বলো, আল্লাহর অনুগত হও এবং রাসূলের অনুসরণকারী হও"। (২৪ঃ ৫৪)

৬। ইখলাস। বান্দা নিয়ত তথা সংকল্পকে শির্কের সমস্ত পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত রেখে স্বীয় আমলকে স্বচ্ছ রাখ-

বে। সুতরাং তার সমস্ত কাজ ও কথা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্তে হবে। তাতে লোক দেখানোর উদ্দেশ্য, বা খ্যাতি অর্জনের অভিলাষ, অথবা কোন লাভের আকাঙ্ক্ষা, কিংবা ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধ করার সাধ, অথবা প্রকাশ্য বা গোপনীয় কোন প্রবৃত্তির সিদ্ধি, আল্লাহর হেদায়েতকে উপেক্ষা করে কোন ব্যক্তি, মযহাব বা দলের অত্যধিক ভালবাসার বশবর্তী হয়ে আমল করার প্রবণতা থাকতে পারে না। বরঞ্চ সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্ট বিধান এবং পারলৌকিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য হতে হবে। কোন মানুষের বিনিময় প্রদান বা কৃতজ্ঞতা পাওয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ الزمر ٣

অর্থাৎ, "সাবধান! বিশুদ্ধ আনুগত্য একমাত্র আল্লাহরই হক"। (৩৯:৩) আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ البينة ٥

অর্থাৎ, "আর তাদেরকে এটা ব্যতীত কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর এবাদত করবে, নিজেদের দ্বীনকে একমাত্র তাঁরই জন্য খালিস করবে"। (৯৮:৫) বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইতবান (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

(فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলল, আল্লাহ তাকে দোযখের উপর হারাম করে দেন"।

৭। ভালবাসা। এ মহান কালেমা ও তার দাবীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা থাকতে হবে। ফলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসবে এবং এ ভালবাসাকে পৃথিবীর সকল ভালবাসার উপর প্রাধান্য দিবে। ভালবাসার শর্তসমূহ ও করণীয় বিষয়গুলো পালন করবে। তাই আল্লাহকে ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভীতি ও আশা সহকারে ভালবাসবে। স্থান, সময়-কাল, ব্যক্তিবর্গ এবং কথা ও কর্মের মধ্যে আল্লাহ যা ভালবাসেন, তা তাকেও ভালবাসতে হবে। যেমন মক্কা, মদীনা ও সমূহ মসজিদ। সময় ও কালের মধ্যে যেমন, রমযান ও জিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন। ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যেমন, নবী, শহীদ ও সৎলোকগণ। কাজ-কর্মের মধ্যে যেমন, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ। কথার মধ্যে যেমন, যিকর, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি। এটাও ভালবাসার পরিচয় যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রিয় বস্তুগুলি স্বীয় প্রিয় বস্তু ও ইচ্ছার উপর প্রাধান্য দিবে। আল্লাহ তা'য়ালা যা অপছন্দ করেন, যেমন কাফের, কুফরী ও পাপাচার ইত্যাদি, তা মনে প্রাণে ঘৃণা করাও উক্ত ভালবাসার পরিচয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ﴾ المائدة ٥٤

অর্থাৎ, "হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের দ্বীন হতে ফিরে যায়, আল্লাহ আরো এমন অনেক লোক সৃষ্টি করবেন, যারা হবে আল্লাহর প্রিয় এবং আল্লাহ হবেন তাদের নিকট প্রিয়, যারা মুমিনদের প্রতি নম্র-বিনয়ী হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করবে না"। (৫:৫৪)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর অর্থ

এ বাক্যটির অর্থ হলো, মৌখিক ও আন্তরিকভাবে স্বীকার করা যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম

সকল মানবকুলের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। আর এ স্বীকৃতির দাবী হলো, তাঁর নির্দেশাবলীর আনুগত্য করা। অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর দেওয়া সংবাদ সত্য বলে বিশ্বাস করা। তিনি যে সব কাজ নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা। আর আল্লাহর এবাদত তাঁরই প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী সম্পাদন করা।
এ বাক্যটির দুটো অংশ রয়েছে। যথা,
১। মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা।
২। মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর এই অংশ দু'টি তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার ব্যাপারে অস্বীকৃতি ঘোষণা করে। তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আর এই উভয় গুণের দ্বারাই তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব। এখানে (আবদ)-এর অর্থ হলো, অধীনস্থ বান্দা। অর্থাৎ, তিনি মানুষ। অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় তিনিও সৃষ্ট। মানুষ হিসাবে তাদের উপর যা প্রযোজ্য, তাঁর উপরেও সমভাবে তা প্রযোজ্য। আল্লাহতা'য়ালা বলেন,

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ﴾ الكهف ١١٠

অর্থাৎ, "হে নবী বলে দাও, আমি তোমাদের মতনই একজন মানুষ"। (১৮ঃ ১১০) আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ﴾ الكهف١

অর্থাৎ, "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোনরূপ বক্রতার অবকাশ রাখেন নাই"। (১৮ঃ ১) আর "রাসূল"-এর অর্থ হলো, তিনি সকল মানব সম্প্রদায়কে আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী, সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। এই উভয় গুণের সাক্ষ্য প্রদান তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাকে অস্বীকার করে। অনেক মানুষ যারা নিজেকে নবীর উম্মত বলে দাবী করে, তাঁর ব্যাপারে অতিরঞ্জিত ও বাড়াবাড়ি করতঃ তাঁকে বান্দার মর্যাদা থেকে সরিয়ে মা'বুদের মর্যাদায় ভূষিত করে থাকে। তাই আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর নিকট ফরিয়াদ ও প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা এবং বিপদ মুক্তির কামনা করে থাকে। অথচ এসব কেবল মাত্র আল্লাহরই ক্ষমতাধীন। আবার অনেকে তাঁর রিসালাতকে অস্বীকার করে অথবা তাঁর অনুসরণে বাড়াবাড়ি করে এবং তাঁর প্রতি প্রেরিত বিধানের পরিপন্থী উক্তির উপর নির্ভর করে।

ঈমানের রুকনসমূহ

কুরআন ও হাদীসের শরীয়তী প্রমাণাদির দ্বারা এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত যে, যাবতীয় সৎ কাজ ও কথা কেবল মাত্র তখনই আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে, যখন উহা বিশুদ্ধ আক্বীদা, অর্থাৎ সঠিক ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে সম্পাদিত হবে। আক্বীদা বিশুদ্ধ না হলে যাবতীয় কথা ও কাজ আল্লাহর নিকট বাতিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴾ المائدة ٥

অর্থাৎ, "যে কেউ ঈমান আনতে অস্বীকার করবে তার জীবনের যাবতীয় কাজ ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে"। (মায়েদাঃ ৫) আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

﴿ وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴾ الزمر ٦٥

অর্থাৎ, "তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তী নবী রাসূলদের প্রতি অবশ্যই এ অহী পাঠানো হয়েছে যে,

তুমি যদি আল্লাহর সাথে শির্ক কর, তাহলে তোমার সব আমল বৃথা হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে"। (৩৯ঃ ৬৫) কুরআন ও সুন্নাতে রাসূল দ্বারা প্রমাণিত বিশুদ্ধ আক্বীদার সারাংশ হলো, আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতার উপর, তাঁর কিতাবের উপর, রাসূল, আখেরাতের দিন এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনা। এ ছয়টি বিষয়ই হলো, সেই সঠিক আক্বীদার মৌলিক বিষয় বস্তু, যা নিয়ে নাযিল হলো কুরআন এবং প্রেরিত হলো আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর এগুলিই হচ্ছে ঈমানের রুকনসমূহ।

১। আল্লাহর প্রতি ঈমান

আল্লাহর প্রতি ঈমানের মূল কথা হলো, এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তিনিই সত্যিকার উপাস্য, একমাত্র এবাদতের যোগ্য। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। কারণ, তিনিই বান্দাদের স্রষ্টা, রিজিক দাতা, অনুগ্রহকারী এবং তাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত। তিনি তাঁর অনুসরণকারীদের প্রতিফল দানে এবং অবাধ্যদের শাস্তি প্রদানে সক্ষম। আর এ এবাদতের জন্যই তিনি জ্বিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ الذاريات ٥٦-٥٨

অর্থাৎ, "আমি জ্বিন ও ইনসানকে কেবল মাত্র আমার এবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের নিকট কোন রিজিক চাইনা। আর এও চাইনা যে, তারা আমাকে খাওয়াবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ নিজেই তো রিজিক দাতা, মহান শক্তিধর ও প্রবল পরাক্রান্ত"। (৫২ঃ ৫৬-৫৭) এ সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য, এর দিকে উদাত্ত আহ্বান জানানোর জন্য এবং উহার পরিপন্থী বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করার জন্যই যুগে যুগে নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ النحل٣٦

অর্থাৎ, "আমরা প্রত্যেক জাতির প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছি। আর তাদের সাহায্যে সকলকে সাবধান করে দিয়েছি যে, আল্লাহর বান্দেগী কর এবং তাগুতের বান্দেগী থেকে দূরে থাক"। (১৬ঃ ৩৬) আর এই এবাদতের প্রকৃত দাবী হলো, দোয়া, ভয়, আশা, নামায, রোযা এবং মানত ইত্যাদি সহ যাবতীয় প্রকারের এবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য তাঁর বিরাটত্ব ও বড়ত্বের সামনে মস্তক অবনত করে সাওয়াবের প্রত্যাশায়, শ্রদ্ধাজড়িত ভয় ও পূর্ণ ভালবাসা সহকারে নিবেদিত করা। কুরআনের অধিকাংশ আয়াত এ মহান মৌলিক নীতি সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ الزمر٣

অর্থাৎ, "দ্বীনকে তাঁরই জন্য খালেস করে আল্লাহর এবাদত কর। সাবধান খালেস আনুগত্য তো কেবল মাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য"। (৩৯ঃ ২-৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ الإسراء٢٣

অর্থাৎ, "তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা কেবল মাত্র তাঁরই এবাদত করবে"। (১৭ঃ ২৩)

﴿ فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ﴾ غافر ١٤

অর্থাৎ, "আল্লাহকেই ডাক, নিজেদের দ্বীনকে তাঁরই জন্য খাঁটিভাবে নির্দিষ্ট করে। তোমাদের এই কাজ কাফেদের পক্ষে যতই দুঃসহ হোক না কেন"।(৪০ঃ ১৪) আল্লাহর উপর ঈমানের আরেকটি দিক হলো, ইসলামের মূল পাঁচটি ভিত্তিসহ ঐ সব বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, যা আল্লাহ বান্দাদের উপর অত্যাবশ্যক ও ফরয করে দিয়েছেন। আর পাঁচটি ভিত্তি হলো,

১। এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রেরিত রাসূল।

২। নামায কায়েম করা।

৩। যাকাত প্রদান করা।

৪। রমযানের রোযা রাখা।

৫। সামর্থবানদের জন্য বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ করা।

এ ছাড়া অন্যান্য ফরয কার্যাদি, যা পবিত্র শরীয়ত বহন করে এনেছে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রুকন হলো, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"-এর সাক্ষ্য প্রদান করা।

এ বিশ্বাসও আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত যে, তিনিই গোটা সৃষ্টিজগতের একমাত্র স্রষ্টা, পরিচালক, নিজের জ্ঞান ও শক্তির দ্বারা যেভাবে ইচ্ছা সকলকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তিনিই দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক। সকলের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোন স্রষ্টা নেই। তিনি বান্দাদের সংস্কার এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাতে মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত, সেদিকে আহ্বান জানাতে যুগে যুগে নবী ও রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন। এ সব ব্যাপারে তাঁর কোন শরীক নেই। যেমন তিনি বলেন,

﴿ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴾ الزمر ٦٢

অর্থাৎ, "আল্লাই প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সব বিষয়ের নিগাহবান"। (৩৯ঃ ৬২)

আল্লাহর প্রতি ঈমানের মধ্যে এটাও শামিল যে, কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর যেসব গুণাবলী ও সুন্দর নামের উল্লেখ হয়েছে, তা হুবহু সেই ভাবেই বিশ্বাস করা। এতে কোন রূপ বিকৃতি অস্বীকৃতি, ধরন-গঠন ও সাদৃশ্য আরোপের চেষ্টা না করে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ঠিক সেই ভাবেই প্রতিষ্ঠিত করা। কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা না করে আল্লাহকে তাঁর উপযুক্ত গুণে গুণান্বিত করা অত্যাবশ্যক। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَّهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴾ الشورى ١١

অর্থাৎ, "কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নেই। তিনি সর্ব শ্রোতা ও সর্ব দ্রষ্টা"। (৪২ঃ ১১)

২। ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

ফেরেশতাদের প্রতি ব্যাপক ও বিশেষ ভাবে ঈমান আনতে হবে। অর্থাৎ, একজন মুসলমান এ বিশ্বাস স্থাপন করবে যে, আল্লাহ তা'য়ালা বিপুল সংখ্যক ফেরেশতাকে তাঁর আনুগত্যের স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা বিভিন্ন প্রকারের। কিছু ফেরেশতা আল্লাহর আরশ বহন করেন। কিছু জান্নাত ও দোযখের রক্ষক। একদল মানুষের আমলনামা সংরক্ষণ করেন। আর বিশেষভাবে ঐ সব ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনতে হবে, যাঁদের নাম কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন জিবরাইল, মিকাইল, মালিক (জাহান্নামের দারওয়ান) এবং সুর ফুঁকার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা ইসরাফিল। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

﴿ خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ ﴾

অর্থাৎ, "ফেরেশতাগণ নূরের সৃষ্টি, জ্বিনকুল খাঁটি আগুন থেকে সৃষ্টি এবং আদমকে যা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা আল্লাহ (কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে) তোমাদেরকে বলে দিয়েছেন"। (মুসলিম শরীফ)

৩। আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান

ব্যাপকভাবে এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহতা'য়ালা সত্যের প্রকাশ ও তার প্রতি আহ্বানের জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূলদের উপর বহু সংখ্যক কিতাব অবতীর্ন করেছেন। আর যে সমস্ত কিতাবের নাম আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, তার প্রতি বিশেষভাবে ঈমান আনতে হবে। যেমন, তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও কুরআন। এ গুলির মধ্যে কুরআনই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ কিতাব, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সংরক্ষক ও সত্যায়নকারী। সমগ্র উম্মতকে এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত বিশুদ্ধ সুন্নাত সহ এই কুরআনেরই অনুসরণ করতে হবে। কেননা, আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমগ্র মানব ও দানবের জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছেন। আর তাঁর প্রতি এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ন করেছেন। যাতে করে তিনি এরই দ্বারা তাদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করেন। আর এই কুরআনকে মহান আল্লাহ অন্তরের যাবতীয় রোগের নিরাময়কারী, প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাদানকারী এবং বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াত ও রহমতের উৎস বানিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ الأنعام١٥٥

অর্থাৎ, "এমনিভাবে এই কিতাব আমরা নাযিল করেছি, এটা এক বরকতওয়ালা কিতাব। অতএব তোমরা এরই অনুসরন করে চল এবং তাকওয়াপূর্ণ নীতি-আচরন গ্রহন কর। হয়তো-বা তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল করা হবে" (৬: ১৫৫) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ النحل٨٩

অর্থাৎ, "আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাদানকারী এবং হেদায়েত, রহমত ও সুসংবাদ (আত্মসমর্পণকারী) মুসলমানদের জন্য"। (১৬: ৮৯)

৪। রাসূলগণের প্রতি ঈমান

রাসূলগণের প্রতি ব্যাপক ও বিশেষভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। তাই আমাদেরকে এই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদেরকে সুসংবাদদানকারী, সতর্ককারী এবং সত্যের প্রতি আহ্বানকারী হিসেবে বহু রাসূল পাঠিয়েছেন। যারা তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করবে, তারা সুফল লাভে ধন্য হবে। আর যারা তাঁদের বিরোধিতা করবে, তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। নবীদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যেমন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ النحل٣٦

অর্থাৎ, "আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। আর তাঁর সাহায্যে সকলকে সাবধান করে দিয়েছি যে, আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তাগুতের বন্দেগী হতে দূরে থাকো"। (১৬: ৩৬) তিনি আরো

বলেন,

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ الأحزاب ٤٠

অর্থাৎ, "মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয়, বরং আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী"। (৩৩ঃ ৪০) আর কুরআন ও হাদীসে যাদের নাম উল্লেখ আছে তাঁদের প্রতি বিশেষভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। যেমন, হযরত নূহ, হুদ, সালেহ, ইবরাহীম ইত্যাদি। তাঁদের প্রতি এবং আমাদের নবীর প্রতি দরুদ ও সালাম বর্ষণ হোক।

৫। আখেরাতের দিনের উপর ঈমান

পরকাল সম্পর্কে আল্লাহতা'য়ালা এবং তাঁর রাসূল যে সব সংবাদ দিয়েছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই আখেরাতের উপর ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। মৃত্যুর পর যা কিছু ঘটবে, যেমন, কবরের পরীক্ষা, সেখানকার আযাব, নে'য়ামত, রোজ কিয়ামতের ভয়াবহতা ও প্রচন্ডতা, মীযান প্রতিষ্ঠা, হিসাব-নিকাশ, প্রতিফল প্রদান, মানুষের মধ্যে আমলনামা বিতরণ, কারো ডান হাতে, কারো বাম হাতে বা পিছন দিক থেকে তা গ্রহণ এ সব কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। অনুরূপ প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদত্ত বিশেষ নে'য়ামত হাওযে কাওসার, জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস, জান্নাতীদের আল্লাহ পাকের দর্শন ও কথোপকথন ইত্যাদি সহ অন্যান্য যে সব ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা। আর এ সবের প্রতি ঈমান আনতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায়।

৬। ভাগ্যের প্রতি ঈমান

ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা বলতে নিম্নের ৪টি বিষয়ের উপর ঈমান আনা বুঝায়। যেমন,

১। এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, অতীতে যা কিছু ঘটেছে, বর্তমানে যা ঘটছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে এ সব কিছু সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণ অবহিত। বান্দাদের অবস্থা, তাদের রিজিক, মৃত্যুক্ষণ, দৈনন্দিন কার্য-কর্ম সহ যাবতীয় ব্যাপারে তিনি সম্যকভাবে অবগত আছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ التوبة ١١٥

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেকটি বস্তু সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত"। (৯ঃ ১১৫)

২। এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ পাক যা কিছু নির্ধারণ ও ফায়সালা করেছেন, সব কিছুই লিপিবদ্ধ রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ يس ١٢

অর্থাৎ, "আর আমি প্রত্যেকটি বস্তু একটি সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি"। (৩৬ঃ ১২)

৩। আল্লাহর কার্যকরী ইচ্ছার উপর বিশ্বাস করা। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা-ই বাস্তবায়িত হয়। আর যা ইচ্ছা করেন না, তা হয় না। আল্লাহ বলেন,

﴿ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ آل عمران ٤٠

অর্থাৎ, "এ ভাবেই আল্লাহ যা চান, তা সম্পাদন করেন"। (৩ঃ ৪০)

৪। এ বিশ্বাস রাখা যে, বিদ্যমান সব কিছু আল্লারই সৃষ্টি। আল্লাহ ব্যতীত কোন স্রষ্টা নেই। নেই কোন প্রতিপালক। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ الأنعام١٠٢

অর্থাৎ, "আর আল্লাহই তোমাদের রব, যিনি ছাড়া আর কোন সত্যিকার ইলাহ নেই। তিনি সব কিছুর স্রষ্টা। সুতরাং তাঁরই এবাদত কর। তিনি তো সব বস্তুর উপর দায়িত্বশীল"। (৬ঃ ১০২)

ইসলাম বিনষ্টকারী বস্তুসমূহ

বহু এমন জিনিস রয়েছে যার সংঘটনে একজন মুসলমান মুরতাদ (ইসলাম বহির্ভূত) পরিগণিত হয়ে যায়। তন্মধ্যে ১০টি জিনিসই বেশী ভয়াবহ ও বেশী সংঘটিত হয়ে থাকে। আর তা হলো,

১। আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করা। আল্লাহতা'য়ালা বলেন,

﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ المائدة٧٢

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন। দোযখই তার ঠিকানা। আর যালেমদের কোন সাহায্যকারী পাওয়া যাবে না"। (৫ঃ ৭২) মৃতকে আহ্বান করা, তাদের নিকট কিছু প্রার্থনা করা, তাদের নামে মানত ও কুরবানী করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

২। নিজের এবং আল্লাহর মধ্যে মাধ্যম ঠিক করা। যারা কোন সত্তাকে মাধ্যম (অসীলা) বলে বিশ্বাস করে, তাদের সুপারিশ কামনা করে এবং তাদের উপর ভরসা করে, তারা কাফের। আল্লাহতায়ালা বলেন,

﴿ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ الجن١٨

অর্থাৎ, " আল্লাহর সহিত অন্য কাউকে ডেকো না"। (৭২ঃ ১৮)

৩। মুশরিকদেরকে কাফের মনে না করা, বা তাদের কাফের হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা, অথবা তাদের ধর্মমতকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা।

৪। রাসূলের আদর্শের চেয়ে অন্য আদর্শকে শ্রেষ্ঠ, পরিপূর্ণ ও কল্যাণকর বলে বিশ্বাস করা। অথবা অন্যের বিধানকে রাসূলের বিধানের থেকে উত্তম বলে মনে করা। যেমন কেউ যদি মনে করে যে, মানব রচিত আইন ও ব্যবস্থাপনা ইসলামের আইনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, অথবা ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন বর্তমানের জন্য যথেষ্ট নয়, কিংবা তা মুসলমানদের অবনতির কারণ, বা এই মনে করা যে, ইসলামী আইনে মানুষ তার প্রভুর সাথে সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তার কোন যোগাযোগ নেই। অথবা এই বিশ্বাস রাখা যে, চোরের হাত কাটা ও অবিবাহিত ব্যভিচারীকে রজম করার ব্যাপারে আল্লাহর যে বিধান তার বাস্তবায়ন যুগোপযোগী নয়। অনুরূপ দৈনন্দিন কার্যাদি ও দন্ডদান ইত্যাদির ক্ষেত্রে আল্লাহর শরীয়ত ব্যতীত বিচার-ফয়সালা করাকে বৈধ বলে মনে করাও এর অন্তর্ভুক্ত, যদিও সে এই বিশ্বাস রাখে না যে, এটা শরীয়তের বিধানের চেয়ে উত্তম।কেননা, এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর হারাম কৃত বস্তুকে সে হালাল মনে করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হারাম কৃত বস্তুকে হালাল মনে করবে, সে কাফের বলে পরিগণিত হবে।

৫। শরীয়তের কোন বিধানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। যদি সেই অনুযায়ী সে আমলও করে, তবুও কাফের বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ محمد ٩

অর্থাৎ, "এটা এই জন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা তারা অপছন্দ করে। কাজেই আল্লাহ তাদের আমল-গুলো নিষ্ফল করে দেবেন"। (৪৭ঃ ৯)

৬। ইসলামের কোন নির্ধারিত বিষয়, বা পুণ্য, অথবা শাস্তিকে বিদ্রূপ করা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، لَاتَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ التوبة ٦٦

অর্থাৎ, "বলো, তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে, তাঁর নিদর্শনগুলোকে এবং তাঁর রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ছিলে? এখন কৈফিয়াত পেশ করো না, কেননা তোমরা ঈমান আনার পর তো কুফরী কার্যে লিপ্ত ছিলে"। (৯ঃ ৬৬)

৭। যাদু করা। যদি কেউ যাদু করে বা যাদুকে বিশ্বাস করে, সে কাফের বিবেচিত হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾ البقرة١٠٢

অর্থাৎ, "অথচ তাঁরা(ফেরেশতারা) যখনই কাউকে এই শিক্ষা দিতেন, তখন প্রথমেই এই কথা বলে স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিতেন যে, দেখ আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র, তোমরা কুফরী পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ো না"। (২ঃ ১০২)

৮। মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য করা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ الأنعام١٤٤

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, তারা তাদের মধ্যেই পরিগণিত হবে। নিশ্চয় আল্লাহ যালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না"। (৬ঃ ১৪৪)

৯। যে কাউকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়তের আওতামুক্ত বলে মনে করে, সে কাফের। কারণ, আল্লাহতা'য়ালা বলেন,

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ آل عمران ٨٥

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতে চায় তার সেই পন্থা একেবারেই কবুল করা হবে না এবং পরকালে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হবে"। (৩ঃ ৮৫) অতএব যার নিকটেই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত পৌঁছে গেছে, সে অন্য শরীয়তের অনুসরণ করতে পারে না এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম-নীতি ব্যতীত অন্য কারো নিয়ম-নীতির মাধ্যমে মুক্তির কামনাও করতে পারে না।

১০। আল্লাহর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা এবং সেই অনুযায়ী আমল না করা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ السجدة٢٢

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি তার রবের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়েও তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে হতে পারে? আমিই অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে থাকি"। (৩২ঃ ২২) তবে এর অর্থইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানার্জন নয়, বরং এর অর্থ ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন, যদ্দ্বারা একজন মানুষ মুসলমান বিবেচিত হয়।

উপরোক্ত ইসলাম বিনষ্টকারী কার্যসমূহ ইচ্ছাকৃতভাবে করা হোক, অথবা ঠাট্টাছলে করা হোক, অথবা কোন ভয়ের কারণে করা হোক, এসবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে জোরপূর্বক কাউকে একাজেবাধাকরলে তার কথা ভিন্ন। তার উপর কিছু আরোপিত হবে না।

أحكام الطهارة والصلاة

পবিত্রতা ও নামাযের বিধান

বৃষ্টি ও সমুদ্রের পানি পবিত্রতা অর্জনের জন্য ব্যবহার করা যায়। অনুরূপ তাহারাত হাসিলের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পানি পুনর্বার ব্যবহার করা যায়। যে পানির সাথে কোন পবিত্র জিনিস মিশে যায় এবং তা নিজ অবস্থায় থাকে, তা পানি বলেই পরিগণিত হয়। তবে যদি নাপাক কোন কিছু মিশে গিয়ে পানির রং, স্বাদ অথবা গন্ধকে পরিবর্তন করে দেয়, তাহলে অপবিত্র বলে গণ্য হবে, তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না। কোন পরিবর্তন সূচিত না হলে, তা পবিত্র বিবেচিত হবে এবং ব্যবহার করা জায়েয হবে। পান করার পর কোন পাত্রে অবশিষ্ট পানি থাকলে, তা পবিত্রতা অর্জনের জন্য ব্যবহার করা যায়, তবে কুকুর বা শূকর তা হতে পান করলে নাপাক হয়ে যাবে।

অপবিত্রতার অর্থ হচ্ছে এমন মলিনতা, অশুচিতা ও অপবিত্রতা,যা থেকে একজন মুসলমানকে বেঁচে থাকতে হয় এবং কাপড়ে লাগলে ধুয়ে ফেলতে হয়। কাপড়ে বা শরীরে অতরল কোন অপবিত্র জিনিস লাগলে তা দূর হওয়া পর্যন্ত ধুতে হবে। যেমন, রক্ত। তবে যদি ধুয়ে ফেলার পরও তার চিহ্ন থেকে যায়, তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। যদি এমন তরল পদার্থ হয়, যা কাপড়ে বা শরীরে লাগলে দৃষ্টি গোচর হয় না, তা একবার ধুয়ে ফেললে যথেষ্ট হবে। জমিতে বা মাটিতে কোন তরল অপবিত্র জিনিস লাগলে, পানি ঢাললে বা শুকিয়ে গেলে তা পবিত্র হয়ে যায়। তবে যদি অতরল হয়, তাহলে তা দূর না করা পর্যন্ত পবিত্র হয় না।

অপবিত্রতার বিধান

১। মানুষের জামা-কাপড় বা শরীরে এমন কিছু অপবিত্র জিনিস লাগলো যা নাপাক কি না জানে না, এমতাবস্থায় তা ধুয়ে ফেলারও দরকার নেই এবং সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করারও প্রয়োজন নেই।
২। নামায শেষ করার পর যদি কেউ শরীরে বা কাপড়ে এমন নাপাক জিনিস দেখে যার সম্পর্কে তার জানা ছিল না, অথবা জানা ছিল কিন্তু ভুলে গিয়েছিল, তাহলে তার নামায শুদ্ধ বলে গণ্য হবে।
৩। কাপড়ে অপবিত্র স্থান ঠিক জানা না থাকলে, পুরো কাপড়টাই ধুতে হবে।

অপবিত্রর প্রকারভেদ

(ক) পেশাব-পায়খানা।
(খ) অদী। পেশাবের পর নির্গত গাঢ় সাদা পদার্থকে অদী বলা হয়।
(গ) মাযী। যৌন উত্তেজনার চরম মুহূর্তে বীর্য পাতের পূর্বে যে শ্বেত তরল পদার্থ বের হয়, তাকে মাযী বলা হয়। এই প্রকারের অপবিত্র শরীরে বা কাপড়ে লাগলে, তা ধুয়ে ফেলা অত্যাবশ্যক। বীর্য পাক, তবে ধুয়ে ফেলা মুস্তাহাব যদি ভিজে থাকে। আর শুকিয়ে গেলে, তা রগড়ে নিলেই পবিত্র হয়ে যায়।
(ঘ) হারাম পশু-পাখির মল ও পেশাব অপবিত্র। পক্ষান্তরে হালাল পশু-পাখির মল ও পেশাব পবিত্র।

প্রস্রাব-পায়খানার আদব

১। প্রস্রাবখানা ও পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে বাঁ পা আগে রেখে এই দো'য়া পাঠ করবে।

(بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ)

(বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল খুবুসি অল খাবা-ইস) অর্থ, আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট খবিস জিন ও জিন্নী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় ডান পা আগে রেখে বলবে, غُفْرَانَكَ (গুফরা-নাকা) হে আল্লাহ! তোমার ক্ষমা চাই।

২। এমন কোন জিনিস নিয়ে পায়খানায় প্রবেশ করবে না, যার মধ্যে আল্লাহর নাম লিখা আছে। তবে নষ্ট বা হারিয়ে যাওয়ার আশংকা বোধ করলে সাথে নিতে পারে।

৩। খোলা মাঠে পেশাব-পায়খানা করার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ ও পিছন করে বসবে না।

৪। লোক চক্ষু থেকে লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখবে এ ব্যাপারে অবহেলা করবে না। পুরুষদের লজ্জাস্থান হলো, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত, তবে নারীদের সমগ্র শরীরটাই ঢাকতে হবে শুধু মুখমন্ডল নামযে খুলে রাখবে।

৫। শরীরে ও কাপড়ে যেন পেশাবের ছিটে না লাগে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

৬। পেশাব-পায়খানার পর পানি নিয়ে তা পরিস্কার করবে। পানি না পেলে মাটি, পাথর অথবা কাগজের কোন টুকরো ইত্যাদি দিয়ে তা পরিস্কার করবে। পরিস্কার করার সময় বাম হাত ব্যবহার করবে।

ওযু

ওযু ব্যতীত নামায গৃহীত হয় না। যার প্রমাণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বাণী। তিনি বলেছেন,

((لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ))

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে কেউ অপবিত্র হয়ে গেলে, ওযু না করা পর্যন্ত আল্লাহ তার নামাযকে গ্রহণ করেন না"।(তিরমিযী-আবু দাউদ) ওযু পর্যায়ক্রমে ও বিনা বিরতিতে করতে হবে।অনুরূপ প্রয়োজনের অধিক পানি খরচ করবে না। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে ওযু করতে দেখে বললেন, "অপচয় করো না" (ইবনে মাজা)

ওযুর পদ্ধতি

১। অন্তরে ওযুর নিয়ত করবে, মুখে নয়। কারণ অন্তরে উদীয়মান কোন কাজের পরিকল্পনাকেই নিয়ত বলা হয়। অতঃপর "বিসমিল্লাহ" বলবে।

২। হাতের তেলোদ্বয়কে কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোবে।

৩। তিনবার কুল্লি করবে ও নাকে পানি নিয়ে নাক ঝাড়বে।

৪। অতঃপর মুখমন্ডলকে এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে এবং মাথার চুল গজানোর স্থান থেকে দাড়ির নিচে পর্যন্ত প্রস্থে তিনবার ধোবে।

৫। অতঃপর হস্তদ্বয়কে আঙ্গুল থেকে কনুই পর্যন্ত তিনবার ধোবে।প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত।

৬। অতঃপর ভিজে হাত দিয়ে মাথার একবার মাসাহ করবে। মাথার অগ্রভাগ থেকে আরম্ভ করে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে আবার অগ্রভাগে ফিরিয়ে এনে ছেড়ে দেবে।

৭। অতঃপর উভয় কানের একবার মাসাহ করবে।উভয় হাতের তর্জনী আঙ্গুলকে উভয় কানের ভিতরের অংশে প্রবেশ করিয়ে ভিতরের দিক এবং বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা কানের বাইরের দিক মাসাহ করবে।

৮। অতঃপর উভয় পা-কে তিনবার আঙ্গুলের ডগা থেকে গাঁট পর্যন্ত ধোবে। প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা।

৯। অতঃপর নিম্নের দোআটি পাঠ করবে

((أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله))

অর্থাৎ, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। তিনি এক ও একক তাঁর কোন শরীক নেই। আর আমি এটাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

মোজায় মাসাহ্ করা

যেহেতু ইসলাম একটি সহজ সরল ধর্ম তাই মোজার উপর মাসাহ্ করার অনুমতি প্রদান করেছে। আর মাসাহ্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে প্রমাণিত একটি বিধান। যেমন আবু জা'ফর বিন আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে তাঁর পাগড়ি ও মোজাদ্বয়ে মাসাহ করতে দেখেছি'। (বুখারী) অনুরূপ মগীরা বিন শো'বা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'একদা আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি সাওয়ারী থেকে অবতরণ করে তাঁর প্রয়োজন পূরণ করলেন। অতঃপর ফিরে এলে আমি আমার ঘটির পানি ঢেলে দিলাম। তিনি ওযু করলেন এবং স্বীয় মোজাদ্বয়ে মাসাহ্ করলেন' (মুসলিম) তবে মোজার উপর মাসাহ্ করার কিছু শর্তাবলী আছে। আর তা হলো, পবিত্রাবস্থায় মোজাদ্বয়কে পরিধান করা। মোজার উপরে মাসাহ্ করা, নিচে নয়। মুকিম (মুসাফির নয়)-এর মাসাহ্ করার সময় সীমা হলো, একদিন একরাত। আর মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত। মাসাহর নির্দিষ্ট সময় সীমা শেষ হয়ে গেলে, অথবা মাসাহ্ করার পর মোজাদ্বয় খুললে, কিংবা অপবিত্র হয়ে গেলে গোসলের জন্য খুললে, মাসাহ্ নষ্ট হয়ে যায়।

ওযু নষ্টকারী বস্তুসমূহ

পেশাব ও পায়খানার দ্বার দিয়ে যা কিছু নির্গত হয়, তদ্দ্বারা ওযু নষ্ট হয়ে যায়। যেমন, পেশাব, পায়খানা, বাতকর্ম, বীর্য, মযী ও অদী ইত্যাদি। তবে বীর্য পাতে গোসল করা ওয়াজিব। অনুরূপ নিদ্রা ও বিনা কোন আবরণে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা, উটের গোস্ত খাওয়া এবং ওযুর ব্যাপারে স্মরণ না থাকা ইত্যাদির কারণেও ওযু নষ্ট হয়ে যায়।

গোসল

গোসল করা বলতে সমস্ত শরীরকে পানি দিয়ে ধোয়া বুঝায়। সুতরাং নাক ঝেড়ে ও কুল্লি করে সমস্ত শরীরকে ধোয়া অত্যাবশ্যক। আর পাঁচটি জিনিসের কারণে গোসল ওয়াজিব হয়। যেমন,

১। জাগ্রত অথবা নিদ্রাবস্থায় উত্তেজনা সহকারে নর-নারীর বীর্য পাত হওয়া। তবে যদি বিনা উত্তেজনায় বীর্য-পাত ঘটে, তাতে গোসল ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ যে স্বপ্নদোষে বীর্যপাত ঘটবে না, তাতেও গোসল ওয়াজিব হবে না। গোসল তখনই ওয়াজিব হবে, যখন বীর্যপাত ঘটবে বা তার কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে।
২। লজ্জাস্থানের সাথে লজ্জাস্থানের মিলন ঘটা যদিও বীর্য পাত না হয়।
৩। মাসিক ও নেফাস (প্রসবজনিত রক্ত) বন্ধ হয়ে যাওয়া।
৪। মৃত্যু, যে মৃতর গোসল ওয়াজিব।
৫। যখন কোন কাফের মুসলমান হবে।

অপবিত্র ব্যক্তির জন্য কুরআন শরীফ স্পর্শ করা, কোথাও নিয়ে যাওয়া, অনুরূপ চুপি চুপি অথবা সশব্দে তা পাঠ করা হারাম। অপবিত্র ব্যক্তি ও ঋতুমতী নারীর জন্য মসজিদে অবস্থান করা জায়েয নয়। তবে মসজিদ হয়ে কোথাও যাওয়াতে দোষ নেই।

তায়াম্মুম

সফরে ও বাড়ীতে অবস্থান করাকালীন ওযু অথবা গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা জায়েয, যখন নিম্নে বর্ণিত কারণসমূহের কোন কারন পাওয়া যাবে।

১। যখন পানি পাওয়া যায় না, অথবা পানি পাওয়া যায়, কিন্তু তা পবিত্রতা হাসেলের জন্য যথেষ্ট নয়। তবে আগে পানির খোঁজ করবে, খোঁজ করার পর পাওয়া না গেলে, তায়াম্মুম করবে। অথবা পানি সন্নিকটেই আছে কিন্তু সেখান থেকে পানি আনতে গেলে জান ও মালের ক্ষতির আশংকা বোধ করে, এমতাবস্থায়ও সে তায়াম্মুম করবে।

২। যদি শরীরের কোন অংশ আহত হয়, তাহলে আহত স্থান ধোবে। তবে ধোওয়াতে ক্ষতি হলে, ভিজে হাত দ্বারা আহত স্থানে মাসাহ করবে। মাসাহ করাও যদি ক্ষতিকর হয়, তাহলে তায়াম্মুম করবে।

৩। যদি পানি, অথবা আবহাওয়া অত্যধিক ঠান্ডা হয় আর পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা থাকে, তাহলে তায়াম্মুম করবে।

৪। সাথে পানি আছে কিন্তু পান করার জন্য তা প্রয়োজন, তাহলে তায়াম্মুম করবে।

তায়াম্মুমের নিয়ম হলো, তায়াম্মুমের নিয়ত করে তেলোদ্বয়কে মাটিতে একবার মারবে। অতঃপর মুখমন্ডল ও তেলোদ্বয় মাসাহ করবে। যদ্দ্বারা অযু নষ্ট হয়, তদ্দ্বারা তায়াম্মুমও নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপ যে ব্যক্তি পানি না পেয়ে তায়াম্মুম করেছিল, সে যদি নামাযের পূর্বে অথবা নামায পড়াকালীন পানি পেয়ে যায়, তার তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যাবে। তবে নামায সমাপ্তির পর পানি পেলে তার নামায শুদ্ধ বলে গণ্য হবে।

নামায

১। নামায ইসলামের মূল ভিত্তিসমূহের দ্বিতীয় ভিত্তি। প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানসম্পন্ন সকল মুসলিম নর-নারীর উপর নামায ওয়াজিব। আলেমদের ঐকমত্যানুযায়ী নামায ত্যাগকারী কাফের। আর সর্ব প্রথম নামায সম্পর্কেই বান্দাকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

২। দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথা, ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা জামা'আত সহকারে আদায় করা প্রত্যেক পুরুষের উপর ওয়াজিব। মুসলমানদের কর্তব্য হলো, ধীরস্থিরতার সাথে মসজিদে আসা। অনুরূপ মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাক'আত নামায আদায় করা সুন্নাত।

৩। নামাযে লজ্জাস্থান ঢাকা অত্যাবশ্যক। পুরুষদের লজ্জাস্থান হলো, নাভি থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত। আর নারী-দের সর্বাঙ্গই লজ্জাস্থান। শুধু নামাযে মুখমন্ডল খুলে রাখতে পারবে। আর ক্বিবলামুখী হয়ে নামায পড়া নামায গ্রহণ হওয়ার জন্য শর্ত।

৪। নামাযকে সঠিক সময়ে আদায় করা ওয়াজিব। সুতরাং সময়ের পূর্বে নামায পড়া ঠিক নয়। অনুরূপ বিলম্ব করে নামায পড়াও হারাম।

নামাযের সময়

১। যোহরের সময় হলো, সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে নিয়ে যখন কোন জিনিসের ছায়া তার সমান হয়ে যায়।

২। আসরের সময় হলো, যখন কোন জিনিসের ছায়া তার সমান হয়ে যায়, তখন থেকে আরম্ভ হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

৩। মাগরিবের সময় হলো, সূর্যাস্ত থেকে শাফাক অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত। আর শাফাক হলো, সূর্যাস্তের পর (পশ্চিম গগনে দৃশ্যমান) লালাকার রক্তিম আভা।

৪। এশার সময় হলো, উক্ত লালাকার আভা অদৃশ্য হওয়ার পর থেকে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত।

৫। ফজরের সময় হলো, ফজর উদয় হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

নামাযের তরীকা

উপস্থিত মন ও ধীরস্থিরতার সাথে নামায আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। নামাযের তরীকা হলো,

১। এদিক ওদিক না চেয়ে সমস্ত শরীর সহ ক্বেবলামুখী হবে।

২। অতঃপর যে নামায পড়তে চলেছে অন্তরে তার নিয়ত করবে, মুখে নয়।

৩। অতঃপর তাকবীরে তাহরীমা পাঠ করবে। বলবে "আল্লাহু আকবার"। তাকবীর বলার সময় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত, অথবা কানের লতি পর্যন্ত উঠাবে।

৪। অতঃপর ডান হাতের চেটোকে বাম হাতে রেখে তা বুকের উপর স্থাপন করবে।

৫। অতঃপর দুআয়ে ইসতিফতাহ পড়বে। আর দুআয়ে ইসতিফতাহ হলো,

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَاإِلَهَ غَيْرُكَ))

"সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অ বিহামদিকা অ তাবা-রাকাসমুকা অ তাআ-লা জাদ্দুকা অ লা-ইলাহা গায়রুকা" অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তোমার নাম কত বরকতময়, তোমার মহিমা কত উচ্চ এবং তুমি ছাড়া কোন সত্যিকার উপাস্য নেই।

৬। অতঃপর (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

"আউযু বিল্লাহি মিনাশশায়ত্বানির রাজীম" পাঠ করবে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭। অতঃপর "বিসমিল্লাহ" বলে সূরা ফাতিহা পড়বে।

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ . اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ . اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ . صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ . غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ .

(আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন, আর রাহমানীর রাহীম, মালিকি ইয়াউ মিদ্দীন, ইয়্যাকানা' বুদু অ ইয়্যাকা নাস্তায়ীন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাক্বীম, সিরাতল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগযুবি আলাইহি অলাযোল্লীন) অর্থাৎ, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি নিখিল জাহানের রব। যিনি দয়াময় মেহেরবান। বিচার দিনের মালিক। আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সঠিক দৃঢ়পথ প্রদর্শন কর। তাদের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ। যারা অভিশপ্ত নয়, যারা পথভ্রষ্ট নয়।

৮। অতঃপর কুরআন থেকে যে কোন সূরা পড়বে।

৯। অতঃপর উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে "আল্লাহু আকবার" বলে রুকু' করবে। আঙ্গুলগুলি ফাঁক ফাঁক করে উভয় হাতের চেটো হাঁটুর উপর স্থাপন করবে। আর রুকু'তে নিম্নের দো'য়াটি তিনবার পাঠ করবে,

((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ))

"সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" অর্থাৎ, আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

১০। অতঃপর নিম্নের দো'য়াটি পাঠ করতঃ রুকু' থেকে মাথা উঠাবে।

((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ))

"সামি আল্লা-হু-লিমান হামিদাহ" অর্থাৎ, আল্লাহ্ প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনেছেন। রুকু' থেকে উঠার সময়ও উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে। তবে মুক্তাদিগণ উক্ত দোয়াটির পরিবর্তে এই দোয়াটি পড়বে "রাব্বানা অ লাকাল হামদ" হে আমাদের প্রভু! তোমারই সমস্ত প্রশংসা।
১১। রুকু' থেকে উঠার পর এই দোয়াটি পড়বে,

(رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ)

(রাব্বানা অলাকাল হামদু, মিলআস সামা ওয়াতি অ মিলআল আরদি অ মিলআ মা শি'তা মিন শায়িন বা'দু) অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু! তোমার জন্য ঐ পরিমান প্রশংসা যা আকাশ ভর্তি করে দেয়, যা পৃথিবী পূর্ণ করে দেয় এবং যা এই দু'য়ের মধ্যবর্তী মহাশূন্যকে পূর্ণ করে দেয়। আর এগুলি ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও তা পূর্ণ করে দেয়।
১২। অতঃপর "আল্লাহ আকবার" বলে প্রথম সেজদাটি করবে। শরীরের সাতটি অঙ্গ দ্বারা সেজদা করবে। আর তা হোল, নাক সহ কপাল, উভয় হাতের তেলো, হাঁটুদ্বয় এবং উভয় পায়ের অগ্রভাগ। সেজদার সময় বগল ও পার্শ্বদ্বয় প্রশস্ত রাখবে এবং সমস্ত আঙ্গুলগুলিকে ক্বেবলামুখী রাখবে। সেজদায় নিম্নের দোয়াটি তিনবার পাঠ করবে।

﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى﴾

"সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।
১৩। অতঃপর "আল্লাহ আকবার" বলে সেজদা থেকে মাথা উঠাবে। উভয় সেজদার মধ্যবর্তী সময়ে বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে বসবে এবং ডান পা উঠিয়ে রাখবে। আর ডান হাত ডান পায়ের উরুর উপর রাখবে। আর বাম হাত বাম পায়ের উরুর উপর রাখবে। উভয় সেজদার মাঝে এই দোআ পাঠ করবে,

((رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَعَافِنِيْ))

(রব্বিগ ফিরলী অরহামনী অহদিনী অরযুক্বনী, অজবুরনী অ আ'ফিনী) অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি রহম কর, আমাকে হেদায়েত দান কর, আমাকে রুজী দান কর, আমার প্রয়োজন মিটাও এবং আমাকে নিরাপত্তা দান কর।
১৪। অতঃপর দ্বিতীয় সেজদা করবে। প্রথম সেজদায় যা কিছু করেছো ও পড়েছো, দ্বিতীয় সেজদায় অনুরূপ করবে ও পড়বে।
১৫। অতঃপর "আল্লাহ আকবার" বলে দ্বিতীয় সেজদা থেকে উঠে (একটু সামান্য বসে) দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াবে। প্রথম রাকআত যেভাবে পড়েছো দ্বিতীয় রাকআতও অনুরূপ পড়বে। দোআয়ে ইসতিফতাহ অর্থাৎ "সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অ বিহামদিকা অ তাবা-রাকাসমুকা অ তাআ-লা জাদ্দুকা অ লা-ইলাহা গায়রুকা" ব্যতীত প্রথম রাকআতের যাবতীয় করনীয় ও পঠনীয় দ্বিতীয় রাকআতে করবে ও পড়বে। অতঃপর দ্বিতীয় রাকআত সমাপ্ত করে বসবে এবং তাশাহহুদ পড়বে। আর তাশাহহুদ হলো,

((اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ

اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ))

(আত তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি অসসালা-ওয়াতু অত্তাইয়িবা-তু আসসালা-মু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিইয়্যু অরাহমাতুল্লা-হি অবারাকা-তুহ, আসসালা-মু আলাইনা অ আলা ইবা-দিল্লা-হিস-সা-লিহীন। আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ। আল্লা-হুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ অ আলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লাইতা আলা ইবরা-হীমা অ আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আলা ইবরা-হীমা অ আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ)

অর্থাৎ, যাবতীয় মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর নিমিত্তে। হে নবী! আপনার উপর সকল প্রকার শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ষণ হোক। আমাদের উপর ও আল্লাহর সকল সৎ বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষন হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর রহমত বর্ষন কর। যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর রহমত বর্ষন করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর বরকত নাযিল কর, যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর বরকত নাযিল করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত। তারপর পড়বে,

((أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ))

(আঊযু বিল্লাহি মিন আযাবি জাহান্নাম, অমিন আযাবিল ক্বাবরি, অমিন ফিতনাতিল মাহয়্যা অলমামাত, অমিন ফিতনাতিল মাসীহিদ্দাজ্জাল) অর্থাৎ,আমি আল্লাহর নিকট জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং জীবন ও মরণের ফিতনা ও দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় কামনা করছি। অতঃপর স্বীয় পছন্দানুযায়ী দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করবে। যদি তিন রাকআত কিংবা চার রাকআত বিশিষ্ট নামায হয়, যেমন মাগরিব, যোহর, আসর ও এশা, তাহলে শুধু অর্ধেক তাশাহহুদ পড়বে। অর্থাৎ, "আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহু" পর্যন্ত পড়বে। অতঃপর "আল্লাহু আকবার" বলে দাঁড়াবে। আর এখানেও উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। অতঃপর ডান হাতের চেটোকে বাম হাতে রেখে তা বুকের উপর স্থাপন করবে। তারপর অবশিষ্ট নামায প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতের ন্যায় পূরণ করবে। তবে (শেষের দু'রাকআতে বা এক রাকআতে) শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে।

১৬। অতঃপর "আসসালামু আলাইকুম অ রাহমাতুল্লাহ" বলে প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে সালাম ফিরবে।

১৭। শেষ তাশাহহুদে তাওয়াররুক করে বসবে। অর্থাৎ, ডান পা-কে খাড়া রেখে এবং জঙ্ঘা (হাঁটু হতে গাঁট পর্যন্ত পায়ের অংশ)-এর নিচে দিয়ে বাম পায়ের পাতার অর্ধেক খানি বের করে রেখে পাছাকে যমীনে ভর করে বসবে। উভয় হস্ত জাঙ্গের উপর ঐ ভাবেই রাখবে যেভাবে প্রথম তাশা'হুদে রেখেছিল। আর এই বৈঠকে পূর্ণ তাশাহহুদ পড়বে। অতঃপর সালাম ফিরবে।

যার নামায ছুটে যায়

যে ব্যক্তির কোন রাকআত অনাদায় রয়ে যাবে, সে ইমামের সালাম ফিরার পর তা আদায় করে নেবে। আর সেটাই তার প্রথম রাকআত হবে, যেটা ইমামের সাথে সে পেয়েছে। যদি ইমামের সাথে রুকু' পায়, তাহলে তার রাকআত পূর্ণ বলে গণ্য হবে। কিন্তু যে ইমামের সাথে রুকু' পাবে না, তাকে সেই রাকআত পূরণ করতে হবে। (তবে এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন আলেমের মতে যে ব্যক্তি রুকু পাবে, তার রাকআত হয়ে যাবে। আবার কোন কোন আলেমের মতে সেটা রাকআত বলে গণ্য হবে না বরং তাকে সেই রাকআত পূরণ করতে হবে।) যে ব্যক্তি নামায আরম্ভ হয়ে যাওয়ার পর আসবে, সে মসজিদে প্রবেশ করে সরাসরি জামা'আতে শামিল হয়ে যাবে। তাতে মুক্তাদীরা দাঁড়ানো অবস্থায় থাকুক, অথবা রুকু, সেজদা, ও যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন তাদের দাঁড়ানোর অপেক্ষা না করে শামিল হয়ে যাবে। তবে তাকবীরে তাহরিমা দাঁড়িয়ে আদায় করবে। অসুস্থ ব্যক্তি বসে আদায় করতে পারবে।

নামায বিনষ্টকারী বস্তুসমূহ

১। ইচ্ছাকৃত বাক্যালাপ, যদিও তা স্বল্প হয়।
২। সমগ্র শরীর সহ কেবলা বিমুখ হয়ে যাওয়া।
৩। পায়খানার দ্বার দিয়ে হাওয়া নির্গত সহ ঐ সমস্ত জিনিস বের হওয়া যার কারণে ওযু ও গোসল ওয়াজিব হয়।
৪। বিনা কারণে অত্যাধিক নড়া-চড়া করা।
৫। হাসি যদিও তা সামান্য হয়।
৬। ইচ্ছাকৃতভাবে একটি রুকু, সেজদা, কিয়াম ও বৈঠক বৃদ্ধি করা।
৭।। ইচ্ছাকৃতভাবে ইমামের আগে কোন কাজ করা।

নামাযে ভুলে গেলে

যদি কোন ব্যক্তি নামাযে কোন কিছু ভুলে যায়, যেমন, প্রথম তাশা' হুদে বসতে ভুলে যায়, বা নামাযে কোন কিছু অপূরণ রয়ে যায় ইত্যাদি, তাহলে সালাম ফিরার পূর্বে দু'সাজদা করবে। তবে যদি নামাযের মধ্যে কোন কিছু বেশী হয়ে যায়, তাহলে সালাম ফিরার পরে দু' সাজদা করবে, তার পর আবার সালাম ফিরাবে। আর নামযের কোন রুকন ভুলে গেলে, নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য সেই রুকন আদায় করা অত্যাবশ্যক। অনুরূপ সাহু সেজদাও অপরিহার্য।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

১। তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া সমস্ত তাকবীর পাঠ করা।
২। রুকু'তে "সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" বলা।
৩। ইমাম ও একা নামায আদায়কারীর "সামিআল্লা-হুলিমান হামিদাহ" বলা।
৪। রুকু' থেকে উঠে "রাব্বানা অলাকাল হামদ" বলা।
৫। সেজদায় "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" বলা।
৬। উভয় সেজদার মধ্যে "রাব্বিগ ফিরলী" দো'য়াটি পাঠ করা।
৭। প্রথম তাশাহহুদ। (৮) প্রথম তাশাহহুদের জন্য বসা।

নামাযের রুকনসমূহ

১। সামর্থ্য থাকলে দাঁড়ানো।
২। তাকবীরে তাহরীমা পাঠ করা।
৩। প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়া।
৪। রুকূ' করা।
৫। সমানভাবে দাঁড়ানো।
৬। দেহের সাত অঙ্গের দ্বারা সেজদা করা।
৭। সেজদা থেকে উঠা।
৮। উভয় সেজদার মধ্যে বসা।
৯। ধীরস্থিরতা বজায় রাখা।
১০। শেষ তাশাহহুদ।
১১। তাশাহহুদের জন্য বসা।
১২। নবীর উপর দরূদ পাঠ করা।
১৩। সালাম ফিরা।
১৪। রুকনসমূহের মধ্যে পর্যায়ক্রম বজায় রাখা।

নামাযের পর পঠনীয় যিকর

তিনবার "আসতাগ ফিরুল্লাহ" বলবে। অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

((اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ))

(আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালাম, অমিনকাস সালাম, তাবারাকতা ইয়াযাল জালালি অল ইকরাম) অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি প্রশান্তিদাতা।তোমার নিকট থেকেই শান্তি। হে মহিমান্বিত প্রতাপান্বিত আল্লাহ! তুমি বরকতময়।

((اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَامُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَايَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ))

(আল্লা-হুম্মা লা-মানিআ' লিমা আ'তায়তা, অলা মু'তিয়া লিমা মানা'তা, লা-য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু) অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা কেউ রোধ করতে পারে না। আর যা রোধ কর, তা কেউ দিতে পারে না। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে বাঁচতে কোন উপকার করতে পারে না।

((لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ))

(লা-হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ) অর্থাৎ, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কেউ ভাল কাজ করতে ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচতে পারে না।

((لَاإِلٰهَ إِلَّااللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ))

(লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অলা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহ, লাহুন্নি'মাতু অলাহুল ফাযলু অলাহুস-সানা উল হাসান) আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার উপাস্য নেই। আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি। সকল সম্পদ ও সকল অনুগ্রহ তাঁরই এবং তাঁরই সুন্দর গুণগান।

((لَاإِلٰهَ إِلَّااللّٰهُ، مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ))

(লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু মুখলিসীনা লাহুদ্দীন, অলাউ কারিহাল কা-ফিরুন) অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। আমরা তাঁর ইবাদতের জন্যই নিবেদিত যদিও তা কাফেরদের নিকট অপছন্দনীয়। নিম্নের দোয়াটি ফজরে ও মাগরিবে দশবার করে পড়া মুস্তাহাব।

((لَاإِلٰهَ إِلَّااللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ))

(লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়্যুহয়ী অ য়্যুমিতু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর) অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল। অতঃপর ৩৩ বার "সুবহান আল্লাহ" ৩৩ বার "আলহামদু লিল্লাহ" ও ৩৩ বার "আল্লাহ আকবার" পড়বে। অতঃপর নিম্নের দোআটি একবার পড়ে ১০০ পূরণ করবে।

((لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ))

(লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা-শারীকা লাহু লা-হুল মুলকু অলা হুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর) অনুরূপ প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ, কুল আয়ুযু বিরাব্বিল ফালাক্ব ও কুল আউযু বিরাব্বি ন্নাস পড়বে। আর সুরা তিনটি ফজরে ও মাগরিবে তিনবার করে পড়া মুস্তাহাব।

সুন্নাত নামায

বার রাকআত সুন্নাতের যত্ন নেওয়া প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য মুস্তাহাব। আর তা হলো, যোহরের পূর্বে চার রাকআত ও পরে দু'রাকআত। মাগরিবের পরে দু'রাকআত, এশার পর দু'রাকআত এবং ফজরের পূর্বে দু'রাকআত।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উক্ত সুন্নাতগুলি কখনোই ত্যাগ করেননি। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি দিন ও রাতে ১২ রাকআত সুন্নাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে"।(মুসলিম) অনুরূপ বিতরের নামায আদায় করাও সুন্নাত।বিতর নামাযের সময় হলো, এশার পর থেকে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত। আর এটি এমন একটি সুন্নাত, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সফরে ও ঘরে উপস্থিত থাকাকালীন কোন অবস্থাতে কখনোই ত্যাগ করেননি। ফজরের দু'রাকআত সুন্নাতও তিনি কখনো ছাড়েননি।

أحكام الزكاة
যাকাতের বিধান

যাকাত হলো ইসলামের রুকনসমূহের তৃতীয়তম রুকন। যে মুসলমান নেসাবের মালিক হয় এবং উহাতে এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়। আল্লাহতা'য়ালা বলেন,

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ (البقرة ١١٠)

অর্থাৎ, 'নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর'। (২:১১০) যাকাতের বিধান প্রণয়নের মধ্যে রয়েছে বহু লাভ ও উপকারিতা। যেমন-

১। আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করণ এবং কৃপণতার অভ্যাসকে তার থেকে দূরীকরণ।

২। দানশীলতার অভ্যাসে মুসলমানদের অভ্যস্ত করণ।

৩। ধনী ও গরীবের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত করা। কারণ মানুষ তার অনুগ্রহকারীর প্রতি ভালবাসা পোষণ করে।

৪। অভাবী মুসলমানদের দেখাশুনা করণ ও তাদের প্রয়োজন পূরণ করণ।

৫। মানুষকে পাপ থেকে পবিত্র করণও যাকাতের উপকারিতার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, যাকাত প্রদানে পাপ মোচন হয় এবং মর্যাদা-সম্মান বৃদ্ধি পায়।

কিসে যাকাত ওয়াজিব হয়?

সোনা ও রূপা, ব্যবসা সামগ্রী, চতুষ্পদ জানোয়ার এবং জমি থেকে উৎপাদিত ফসলে যাকাত ওয়াজিব হয়।

সোনা ও রূপার যাকাত

সোনা ও রূপা যে প্রকারের হোক না কেন যখনই কেউ নেসাবের মালিক হবে, তখনই তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। সোনার নেসাব হলো, 'কুড়ি মিসকাল' অর্থাৎ, ৭০ গ্রাম সমপরিমাণ। আর রূপার নেসাব হলো, '২০০ দিরহাম নববী' অর্থাৎ, ৪৬০ গ্রাম সমপরিমাণ। যে ব্যক্তি সোনার উল্লেখিত নেসাবের মালিক হবে, তাকে শতকরা আড়াই ভাগ (২.৫ %) যাকাত আদায় করতে হবে। আর যে ব্যক্তি রূপার উল্লেখিত নেসাবের মালিক হবে, তাকে সাড়ে এগার গ্রাম যাকাত আদায় করতে হবে। যদি কেউ প্রচলিত মুদ্রায় সোনার ও রূপার যাকাত আদায় করতে চায়, তাহলে তাকে এক বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার সময় এক গ্রাম সোনা ও রূপার দাম কত সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে হবে। অতঃপর প্রচলিত মুদ্রায় সেই সমপরিমাণ যাকাত আদায় করবে। এর উদাহরণ হলো-

মনে করুন, যদি কোন ব্যক্তি ১০০ গ্রাম সোনার মালিক হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা, সে নেসাবের মালিক হয়ে গেছে। আর তাকে যাকাত লাগবে শতকরা আড়াই ভাগ (২.৫ %)। এবার যদি সে প্রচলিত মুদ্রায় যাকাত আদায় করতে চায়, তাহলে এক বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার সময় সোনার দাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে এবং ২.৫ % সোনার যা মূল্য হয়, সেই সমপরিমাণ যাকাত প্রচলিত মুদ্রায় আদায় করবে। অনুরূপ প্রচলিত মুদ্রাতেও যাকাত ওয়াজিব, যদি তা নেসাব পর্যন্ত পৌঁছে এবং এক বছর অতিবাহিত হয়। সুতরাং যদি কেউ ৭০ গ্রাম স্বর্ণের মূল্যের মালিক হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। তাকে ২.৫ % সমপরিমাণ যাকাত আদায় করতে হবে। যে মুসলমানের নিকট এক বছর পর্যন্ত গচ্ছিত কোন মাল থাকবে, সে সোনা বিক্রেতাকে ৭০ গ্রাম সোনার মূল্য জিজ্ঞাসা করবে। অতঃপর তার মাল যদি সেই

পরিমাণ হয়, তাহলে যাকাত আদায় করবে। কিন্তু যদি তার মাল সেই পরিমাণ না হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। এর উদাহরণ নিম্নরূপ-

যদি কোন ব্যক্তির নিকট ৮০০ ডলার থাকে এবং তাতে এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে সে এক গ্রাম সোনার দাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, যদি তার দেশের মুদ্রার মূল্য সোনার উপর নির্ধারিত হয়, অথবা রূপার মূল্য জিজ্ঞাসা করবে, যদি তার দেশের মুদ্রার মূল্য রূপার উপর নির্ধারিত হয়। অতঃপর যদি দেখে ৭০ গ্রাম সোনার দাম ৮৪০ ডলার সমপরিমাণ, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। কারণ তার নিকট যে মুদ্রা রয়েছে, তা ৭০ গ্রাম সোনার দাম পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। রূপার ব্যাপারটাও অনুরূপ।

ব্যবসায় সামগ্রীতে যাকাত

টাকা-পয়সার মালিকসম্পন্ন এমন মুসলিম ব্যবসায়ী যে তার টাকা-পয়সাকে ব্যবসায় লাগিয়েছে, ইসলাম তার উপর বার্ষিক যাকাত আদায় করাকে অত্যাবশ্যক করেছে। যাতে করে আল্লাহর অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় হয় এবং স্বীয় অভাবী ভাইদের প্রয়োজন পূরণ হয়। স্থাবর সম্পত্তি, পশু, খাদ্য দ্রব্য ও গাড়ি ইত্যাদি সহ যা কিছু লাভের উদ্দেশ্যে কেনা-বেচার জন্যই রাখা হয়েছে, এ সবেরই যাকাত লাগবে। তবে এই প্রকার জিনিসের উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হলো, নেসাব পর্যন্ত পৌঁছান। আর সোনা অথবা রূপার মূল্য অনুপাতেই এ সবের নেসাব নির্বাচিত হবে। সুতরাং সোনা ও রূপার নেসাবের যা মূল্য হয়, ততটা সমপরিমাণ উল্লেখিত ব্যবসায় সামগ্রী যদি কারো নিকট থাকে, তাকে ২.৫ % যাকাত আদায় করতে হবে। তাই যদি কেউ এক লাখ ডলার সমপরিমাণ ব্যবসায় সামগ্রীর মালিক হয়, তাকে ২৫০০ ডলার যাকাত দিতে হবে। আর যারা শুধু ক্রয়-বিক্রয় করে, তাদের কর্তব্য হলো, প্রত্যেক বছরের শুরুতে তাদের নিকট মজুদ তহবিলের হিসাব করা এবং উহার যাকাত আদায় করা। যদি কোন ব্যক্তি তার নিকট সঞ্চিত অর্থের এক বছর অতিবাহিত হওয়ার দশদিন পূর্বে অন্য সামান কিনে নেয়, তাহলে তাকে সমষ্টির যাকাত আদায় করতে হবে। আর প্রথম যেদিন থেকে ব্যবসা আরম্ভ করবে, সেদিন থেকেই বছরের গণনা শুরু হবে। যাকাত বছরে একবারই লাগে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত তার নিকট মজুদ জিনিসের যাকাত যেন প্রত্যেক বছর আদায় করে দেয়। যে পশুর চারার ব্যবস্থা করতে হয়, তা যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে, সংখ্যায় নেসাব পর্যন্ত পৌঁছাক আর না পৌঁছাক তাতে কোন কিছু এসে যায় না। প্রচলিত মুদ্রায় তার মূল্য নেসাব পর্যন্ত পৌঁছালেই, তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে এবং প্রচলিত মুদ্রায় তার যাকাত আদায় করতে হবে।

শরীকানায় যাকাত

বর্তমানে মানুষ স্থাবর সম্পত্তি ইত্যাদিতে শরীকানায় যৌথভাবে কারবার করে। আবার কেউ কেউ এতে কয়েক বছর পর্যন্ত তার পুঁজি লাগিয়ে রাখে, যা বৃদ্ধি পেতেও পারে, আবার হ্রাস পেতেও পারে। এই শরীকানায় যাকাত ওয়াজিব। কেননা, এটা ব্যবসায় সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত প্রত্যেক বছর তার অংশের মূল্য সম্পর্কে জানবে এবং তার যাকাত আদায় করবে, অথবা যখন তার অংশ বিক্রি করবে এবং তার মূল্য হাতে আসবে, তখন সমস্ত বছরের যাকাত এক সাথে আদায় করবে।

জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের যাকাত

খেজুর, পনির, গম, যব এবং ধান ইত্যাদি সহ যে ফসল ও ফলাদি ওজন করা যায় ও সংরক্ষিত রাখা যায়, তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে ফল-মূল (যা সংরক্ষিত রাখা যায় না) ও শাক-সবজীতে যাকাত ওয়াজিব হয় না। আর উল্লেখিত ফসলে যাকাত তখনই ওয়াজিব হবে, যখন তা নেসাব পর্যন্ত পৌঁছবে। ফসলের নেসাব

হলো, ৬৭৫ কিলো গ্রাম। তবে যবের নেসাব হলো, ৫৫২ কিলো গ্রাম। এ প্রকারের জিনিসে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত আরোপিত হবে না। আর এই প্রকারের ফসলাদি যদি কোন প্রকারের শ্রম ব্যতীত বৃষ্টি অথবা নদীর বা প্রবহমান কূপের পানির সাহায্যে চাষাবাদ করা হয়, তাহলে উক্ত জমির উৎপাদিত ফসলের দশভাগের একভাগ যাকাত আদায় করতে হবে। কিন্তু যে জমি শ্রমের সাহায্যে সেচ করতে হয়, সে জমির উৎপন্ন ফসলের বিশভাগের একভাগ লাগবে। যেমন মনে করুন, কোন ব্যক্তি গম লাগালো এবং তাতে ৮০০ কিলো গম উৎপাদিত হলো, এমতাবস্থায় উহাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। কারণ, গমের নেসাব হলো, ৬৭৫ কিলো গ্রাম। আর উহাতে দশভাগের একভাগ, অর্থাৎ ৮০ কিলো লাগবে, যদি বিনা শ্রমে চাষাবাদ হয়ে থাকে। তবে যদি শ্রমের সাহায্যে চাষাবাদ হয়ে থাকে, তাহলে তাতে বিশভাগের একভাগ অর্থাৎ, ৪০ কিলো লাগবে।

চতুষ্পদ জন্তুর যাকাত

চতুষ্পদ জন্তু বলতে, উট, গরু-মোষ, ছাগল ও ভেড়াকে বুঝানো হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত শর্তের ভিত্তিতে এ সবের যাকাত ওয়াজিব হবে।

১। নেসাব পর্যন্ত পৌঁছানো। উটের সর্ব নিম্ন নেসাব হলো, পাঁচ। ছাগল ও ভেড়ার নেসাব হলো, চল্লিশ। গরু ও মোষের নেসাব হলো, ত্রিশ। এই নেসাবের কম উট, গরু-মষ, ছাগল ও ভেড়া থাকলে, তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

২। মালিকের নিকট এক বছর অতিবাহিত হওয়া।

৩। চারণভূমিতে চরে খাওয়া জানোয়ার হওয়া। অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে সেই জন্তুরই যাকাত আদায় করতে হবে, যারা বছরের অধিকাংশ দিনগুলিতে চরে খায়। কিন্তু যাদের কিনে খাওয়াতে হয়, অথবা, যাদের খাওয়ার ব্যবস্থা মালিক নিজে করে, সেগুলিতে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

৪। কাজের জন্য যেন না হয়। যাকে মালিক চাষের কাজে ও বোঝাবহন ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করে, তাতে যাকাত লাগবে না।

উটের যাকাত

উটের যাকাত তখনই ওয়াজিব হবে, যখন তা পাঁচ পর্যন্ত নেসাবে পৌঁছবে। সুতরাং যখন কোন মুসলমান পাঁচ থেকে নয়টি উটের মালিক হবে এবং তাতে এক বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে, তাকে একটি ছাগল যাকাত হিসাবে দিতে হবে। আর ১০ থেকে ১৪টি উটের মালিক হলে, দু'টি ছাগল লাগবে। আর ১৫ থেকে ১৯টি উটের মালিক হলে, তিনটি ছাগল লাগবে। ২০ থেকে ২৪টি উটের মালিক হলে, ৪টি ছাগল লাগবে। ২৫ থেকে ৩৫টি উটের মালিক হলে, একটি 'বিনতে মাখায' অর্থাৎ, পূর্ণ এক বছরের একটি উটের বকনা বাছুর লাগবে। তবে যদি এক বছরের বকনা বাছুর না পায়, তাহলে 'ইবনে লাবুন' অর্থাৎ, পূর্ণ দুই বছরের একটি দামড়া বাছুর যথেষ্ট হবে। আর যদি ৩৬ থেকে ৪৫টি উটের মালিক হয়, তাহলে তাকে একটি 'বিনতে লাবুন' অর্থাৎ, পূর্ণ দুই বছরের বকনা বাছুর লাগবে। আর ৪৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত উটে 'হিক্কা' অর্থাৎ, পূর্ণ তিন বছরের বাছুর লাগবে। আর ৬১ থেকে ৭৫টি উটে 'জিযআ' অর্থাৎ, পূর্ণ চার বছরের বকনা বাছুর লাগবে। ৭৬ থেকে ৯০টি উটে 'বিনতা লাবুন' অর্থাৎ, পূর্ণ দুই বছরের দু'টি বকনা বাছুর লাগবে। আর ৯১ থেকে ১২০টি উটের মালিক হলে, তাতে 'হিক্কাতান' অর্থাৎ, পূর্ণ তিন বছরের দু'টি বকনা বাছুর লাগবে। উল্লেখিত নেসাবের অতিরিক্ত হলে প্রত্যেক চল্লিশে একটি দুই বছরের বাছুর এবং প্রত্যেক পঞ্চাশে তিন বছরের বাছুর লাগবে।

নিম্নের তালিকাটি উটের যাকাতের ব্যাপারটা আরো সুন্দরভাবে বুঝতে সহায়তা করবে।

সংখ্যা		লাগবে	সংখ্যা		লাগবে
থেকে	পর্যন্ত		থেকে	পর্যন্ত	
৫	৯	একটি ছাগল।	৩৬	৪৫	উটের পূর্ণ দুই বছরের একটি বকনা বাছুর।
১০	১৪	দু'টি ছাগল।	৪৬	৬০	পূর্ণ তিন বছরের বকনা বাছুর।
১৫	১৯	তিনটি ছাগল।	৬১	৭৫	পূর্ণ চার বছরের বকনা বাছুর।
২০	২৪	চারটি ছাগল।	৭৬	৯০	পূর্ণ এক বছরের দু'টি বাছুর।
২৫	৩৫	উটের পূর্ণ এক বছরের একটি বকনা বাছুর।	৯১	১২০	পূর্ণ চার বছরের দু'টি বাছুর।

গরু ও মোষের যাকাত

যদি কোন ব্যক্তি ৩০ থেকে ৩৯টি গরু ও মোষের মালিক হয়, তাহলে তাকে পূর্ণ এক বছরের একটি বাছুর যাকাত হিসাবে দিতে হবে। আর যদি ৪০ থেকে ৫৯টি গরু ও মোষের মালিক হয়, তাহলে পূর্ণ দুই বছরের একটি বাছুর দিতে হবে। ৬০ থেকে ৬৯টির বাছুর লাগবে। অতঃপর প্রত্যেক মালিক হলে, পূর্ণ এক বছরের দু'টি বাছুর লাগবে। আর ৭০ থেকে ৭৯টির মালিক হলে, একটি এক বছরের ও একটি দুই বছরের ৩০টায় একটি এক বছরের এবং প্রত্যেক ৪০টায় দুই বছরের বাছুর লাগবে। নিম্নের তালিকায় দেখুন,

সংখ্যা		যাকাত লাগবে
থেকে	পর্যন্ত	
৩০	৩৯	পূর্ণ এক বছরের বাছুর।
৪০	৫৯	পূর্ণ দুই বছরের বাছুর।
৬০	৬৯	পূর্ণ এক বছরের দু'টি বাছুর।
৭০	৭৯	একটি এক বছরের ও একটি দুই বছরের বাছুর।

ছাগলের যাকাত

যদি কোন ব্যক্তি ৪০ থেকে ১২০টি ছাগলের মালিক হয়, তাহলে একটি ছাগল যাকাত হিসাবে আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। আর ১২১ থেকে ২০০টি ছাগলের মালিক হলে, দু'টি ছাগল তার উপর ওয়াজিব হবে।২০১ থেকে ৩০০ পর্যন্ত তিনটি ছাগল লাগবে। ৩০১ থেকে ৪০০ পর্যন্ত চারটি ছাগল দিতে হবে। ৪০১ থেকে ৫০০ পর্যন্ত পাঁচটি ছাগল লাগবে। অতঃপর প্রত্যেক ১০০টায় একটি করে লাগবে।

তালিকা

সংখ্যা		যাকাত লাগবে।
থেকে	পর্যন্ত	
৪০	১২০	একটি ছাগল।
১২১	২০০	দু'টি ছাগল।
২০১	৩০০	তিনটি ছাগল।
৩০১	৪০০	চারটি ছাগল।
৪০১	৫০০	পাঁচটি ছাগল।

যাকাতের হকদার

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة ٦٠)

অর্থাৎ, 'এই সাদকাসমূহ মূলতঃ ফকীর ও মিসকীনদের জন্য, আর তাদের জন্য যারা সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং তাদের জন্য যাদের মন জয় করা হলো উদ্দেশ্য। সেই সাথে এটা গলদেশের মুক্তিদানে ও ঋণ ভারাক্রান্তদের সাহায্যে, আল্লাহর পথে ও পথিক মুসাফিরদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য; এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক'।(৯:৬০) এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ আট প্রকার মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা যাকাতের হকদার। ইসলামে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হয় সামাজিক উন্নয়নে ও অভাবীদের মধ্যে। অন্যান্য ধর্মের ন্যায় যাকাত শুধু আলেম-উলামাদের জন্য নির্দিষ্ট নয়।

১। ফকীর তাকেই বলা হয়, যার নিকট প্রয়োজনের অর্ধেকও থাকে না।

২। মিসকীন তাকে বলা হয়, যার নিকট তার প্রয়োজনের অর্ধেক থেকে বেশী থাকে, কিন্তু তাতে তার যথেষ্ট হয় না। সুতরাং তাকে তার প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ যাকাত থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত, অথবা এক বছর পর্যন্ত দেওয়া যাবে।

৩। সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা। অর্থাৎ, যাদেরকে বাদশাহ্ কর্তৃক যাকাত আদায়ের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। তাদেরকে তাদের কাজানুযায়ী উচিত অর্থ দিতে হবে যদিও তারা ধনী হয়।

৪। তাদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ, এমন সর্দার যার বংশের লোকেরা তার অনুসরণ করে, যার ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায়, অথবা যার থেকে মুসলমানদের অনিষ্টের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। অনুরূপ ইসলামে নবাগত মুসলমান, যারা এ সকল প্রকারের মানুষকে তাদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের ঈমানকে আরো সুদৃঢ় করতে যাকাত থেকে দেওয়া যাবে।

৫। অনুরূপ ক্রীতদাসকে তার দাসত্ব জীবন থেকে মুক্তি দিতে এবং দুশমনের হাতে বন্দীদের ছাড়াতে যাকাতের অর্থ ব্যায় করা যাবে।

৬। ঋণীদেরকে। অর্থাৎ, যাদের উপর ঋণের বোঝা, তাদেরকে ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে। তবে শর্ত হলো, তাকে মুসলমান হতে হবে এবং সে এমন কোন ধনী ব্যক্তি যেন না হয়, যে তার ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম। আর তার ঋণ যেন এমন হয়, যা অতিসত্ত্বর আদায় করা দরকার এবং উহা কোন অন্যায় কাজে যেন গ্রহন করা না হয়ে থাকে।

তালিকা

সংখ্যা		যাকাত লাগবে।
থেকে	পর্যন্ত	
৪০	১২০	একটি ছাগল।
১২১	২০০	দু'টি ছাগল।
২০১	৩০০	তিনটি ছাগল।
৩০১	৪০০	চারটি ছাগল।
৪০১	৫০০	পাঁচটি ছাগল।

যাকাতের হকদার

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة ٦٠)

অর্থাৎ, 'এই সাদকাসমূহ মূলতঃ ফকীর ও মিসকীনদের জন্য, আর তাদের জন্য যারা সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং তাদের জন্য যাদের মন জয় করা হলো উদ্দেশ্য। সেই সাথে এটা গলদেশের মুক্তিদানে ও ঋণ ভারাক্রান্তদের সাহায্যে, আল্লাহর পথে ও পথিক মুসাফিরদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য; এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক'।(৯ঃ৬০) এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ আট প্রকার মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা যাকাতের হকদার। ইসলামে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হয় সামাজিক উন্নয়নে ও অভাবীদের মধ্যে। অন্যান্য ধর্মের ন্যায় যাকাত শুধু আলেম-উলামাদের জন্য নির্দিষ্ট নয়।

১। ফকীর তাকেই বলা হয়, যার নিকট প্রয়োজনের অর্ধেকও থাকে না।

২। মিসকীন তাকে বলা হয়, যার নিকট তার প্রয়োজনের অর্ধেক থেকে বেশী থাকে, কিন্তু তাতে তার যথেষ্ট হয় না। সুতরাং তাকে তার প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ যাকাত থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত, অথবা এক বছর পর্যন্ত দেওয়া যাবে।

৩। সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা। অর্থাৎ, যাদেরকে বাদশাহ্ কর্তৃক যাকাত আদায়ের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। তাদেরকে তাদের কাজানুযায়ী উচিত অর্থ দিতে হবে যদিও তারা ধনী হয়।

৪। তাদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ, এমন সর্দার যার বংশের লোকেরা তার অনুসরণ করে, যার ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায়, অথবা যার থেকে মুসলমানদের অনিষ্টের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। অনুরূপ ইসলামে নবাগত মুসলমান, যারা এ সকল প্রকারের মানুষকে তাদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের ঈমানকে আরো সুদৃঢ় করতে যাকাত থেকে দেওয়া যাবে।

৫। অনুরূপ ক্রীতদাসকে তার দাসত্ব জীবন থেকে মুক্তি দিতে এবং দুশমনের হাতে বন্দীদের ছাড়াতে যাকাতের অর্থ ব্যায় করা যাবে।

৬। ঋণীদেরকে। অর্থাৎ, যাদের উপর ঋণের বোঝা, তাদেরকে ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে। তবে শর্ত হলো, তাকে মুসলমান হতে হবে এবং সে এমন কোন ধনী ব্যক্তি যেন না হয়, যে তার ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম। আর তার ঋণ যেন এমন হয়, যা অতিসত্বর আদায় করা দরকার এবং উহা কোন অন্যায় কাজে যেন গ্রহণ করা না হয়ে থাকে।

৭। আল্লাহর পথে। অর্থাৎ, যে মুজাহিদ বিনা কোন বেতনে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তাদের জন্য, অথবা তাদের অস্ত্র-শস্ত্র কেনার জন্য যাকাত থেকে দেওয়া যাবে। অনুরূপ যারা শরীয়তী জ্ঞানার্জন করে, তারাও জিহাদের আওতায় পরে। সুতরাং এমন কেউ যদি থাকে, যে শরীয়তী জ্ঞানার্জন করতে চায়, কিন্তু তার অর্থের অভাব, এমতাবস্থায় তাকে শরীয়তী জ্ঞানার্জনে সক্ষম করতে যাকাত থেকে দেওয়া জায়েয হবে।

৮। মুসাফির। অর্থাৎ, যে পথি মধ্যে নিঃস্ব হয়েগেছে। তার নিকট তার বাড়ী পর্যন্ত পৌছার মত কিছুই নাই, এমতাবস্থায় তাকে বাড়ী পর্যন্ত পৌছার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যাকাত থেকে দেওয়া যাবে, যদিও সে তার শহরে ধনী ব্যক্তি হয়।

যাকাতের অর্থ কোন মসজিদ নির্মাণে এবং রাস্তা-ঘাট মেরামতের কাজে ব্যয় করা যাবে না।

<u>বিঃদ্রঃ</u>

১। সমুদ্র থেকে অর্জিত জিনিসে যাকাত ওয়াজিব হবে না, যদি তা ব্যবসার জন্য না হয়। যেমন, মণি-মুক্তা, প্রবাল ও মাছ ইত্যাদি।

২। ভাড়াটে ঘরে, ফ্যাক্টরী ইত্যাদিতে যাকাত ওয়াজিব নয়। তবে তা থেকে উপার্জিত অর্থে যাকাত ওয়াজিব হবে, যদি এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। যেমন মনে করুন, এক ব্যক্তি বাড়ী ভাড়া দিল এবং বাড়ীর ভাড়া সে পেল, এমতাবস্থায় তার এই ভাড়া থেকে উপার্জিত অর্থ যদি নেসাব পর্যন্ত পৌছে যায় ও এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

أحكام الصيام
রোযার বিধান

রমযানের রোযা ইসলামের পাঁচটি মূল ভিত্তিসমূহের অন্যতম ভিত্তি। যার প্রমাণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী। তিনি বলেন, "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর রাখা হয়েছে। আর তা হলো, এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রেরিত রাসূল। নামায আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ ব্রত পালন করা এবং রমযান মাসের রোযা রাখা। (বুখারী-মুসলিম) আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ফজর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, যৌনবাসনা পূরণ ও অন্যান্য সমূহ খাদ্যদ্রব্য থেকে বিরত থাকার নামই হলো রোযা। রমযানের রোযা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সকলের এক মত। আর রমযানের রোযা ওয়াজিব হওয়ার প্রমান হলো, আল্লাহর এই বাণী, "কাজেই যে ব্যক্তিই এই মাসের সম্মুখীন হবে তার পক্ষে এই পূর্ণ মাসের রোযা রাখা একান্ত কর্তব্য"। (বাকারাহঃ ১৮৫) জ্ঞানসম্পন্ন প্রাপ্ত বয়স্ক সকল মুসলমানের উপর রোযা ওয়াজিব। ১৫ বছর বয়স সম্পূর্ণ হলে, অথবা নাভির নিচের লোম উদগত হলে, অথবা স্বপ্নদোষ ইত্যাদির কারণে বীর্যস্খলন ঘটলে, বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) বলে গণ্য হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ, তবে তাদের ক্ষেত্রে একটি জিনিস বৃদ্ধি হবে আর তা হলো, হায়েজ (মাসিক বা ঋতুস্রাব) আরম্ভ হওয়া। উপরোক্ত জিনিসের কোন একটি কারো মধ্যে প্রকাশ পেলে, সে বালেগ বলে গণ্য হবে।

রমযান মাসের মাহাত্ম্য

আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র রমযান মাসকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণে বিশেষিত করেছেন, যা অন্যান্য মাসে পাওয়া যায় না। আর এই মাসের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে হলো-

১। ফেরেশতাকুল রোযাদারের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন যতক্ষণ না সে ইফতারী করে।

২।[প্রত্যেক দিন আল্লাহ্ তা'য়ালা জান্নাতকে সুসজ্জিত করেন এবং বলেন, " অতি সত্বর আমার সৎ বান্দারা কষ্ট-ক্লেশ থেকে মুক্তি লাভ করে তোমার নিকট পৌঁছবে"।

৩। বিতাড়িত শয়তানকে এ মাসে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।

৪। এ মাসে রয়েছে একটি কদরের (সম্মানিত) রাত যা এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।

৫। রমযান মাসের শেষ রাত্রিতে সকল রোযাদারকে ক্ষমা করা হয়।

৬। এই মাসের প্রত্যেক রাতে আল্লাহ্ তা'য়ালা অনেক মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।

৭। এই মাসের একটি উমরার সাওয়াব একটি হজ্জের সমান।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথিত অনেক বাণীর দ্বারাও এ মাসের ফযিলত ও গুণ প্রকাশ পায়, যেমন তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস ও নেকীর আশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার বিগত গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে"। (বুখারী-মুসলিম) অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আদম সন্তানের প্রত্যেক সৎ কাজের বিনিময় দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, কিন্তু রোযা আমারই (আমার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই রেখেছে) তার প্রতিদান আমি নিজে দেবো। (ইবনে মাজা)

রমযান প্রবেশের প্রমাণ

দু'টি জিনিসের যে কোন একটির দ্বারা রমযান প্রবেশের প্রমাণ হয়। যেমন,

১। রমযান মাসের চাঁদ দেখা। চাঁদ দেখা গেলেই রোযা ওয়াজিব হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "চাঁদ দেখে রোযা রাখবে এবং চাঁদ দেখেই রোযা ছাড়বে"। (বুখারী-মুসলিম) রমযানের চাঁদ দেখার প্রমাণে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে। তবে রোযা ছাড়ার ক্ষেত্রে শাওয়াল মাসের চাঁদের প্রমাণে দু'জন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তির সাক্ষ্য অত্যাবশ্যক।

২। শাবান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ করা। ৩০দিন পূর্ণ করলে ৩১ দিনটাই রমযান মাসের প্রথম তারীখ হবে, কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, তাহলে শাবান মাসের ৩০দিন পূর্ণ করো"।(বুখারী-মুসলিম)

কাদের জন্য রোযা ছাড়া জায়েয?

১। এমন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যার আরোগ্যের আশা করা যায়। তার উপর রোযা রাখা কষ্টকর হলে, ছেড়ে দেবে এবং পরে তা কাযা করবে। কারো ব্যাধি যদি চিরস্থায়ী হয় অর্থাৎ যার আরোগ্যের আশা না থাকে তবে, তার পক্ষে রোযা রাখা জরুরী নয়। সে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে এক মুদ (৫৫০ গ্রাম) খাদ্য দ্রব্য দ্বারা খাওয়াবে, অথবা পানাহারের আয়োজন করে যতদিন রোযা ছেড়েছে ততগুলো মিসকিনকে আমন্ত্রন করে খাওয়াবে।

২। মুসাফিরঃ মুসাফির বাড়ী থেকে যাওয়া থেকে নিয়ে পুনরায় বাড়ী প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত রোযা ছেড়ে দিতে পারবে। যে শহরে সফর করে গেছে সেখানে বহুদিন অবস্থান করলেও মুসাফির বলে গণ্য হবে যতদিন তার এই নিয়্যাত থাকবে যে, উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার পর সেখানে অবস্থান করবে না। আর এই বিধান এমন সফরের ক্ষেত্রে যার দূরত্ব ৮০ কিমিঃ ও তার উর্ধ্বে হবে।

৩। গর্ভবতী ও দুধদানকারিণী মহিলারা নিজের ও ছেলের উপর কোন ক্ষতির আশংকা বোধ করলে, রোযা ছেড়ে দিতে পারবে। অতঃপর কারণ দূরীভূত হয়ে গেলে ত্যাগকৃত দিনগুলির রোযা কাযা করবে।

৪। যে বৃদ্ধ ব্যক্তির উপর রোযা রাখা কষ্টকর হবে, সে রোযা ছেড়ে দেবে এবং তাকে কাজাও করতে হবে না। তবে প্রত্যেক দিন একজন মিসকিন খাওয়াবে।

রোযা নষ্টকারী বস্তুসমূহ

১। ইচ্ছাকৃত পানাহার করা, তবে ভুলক্রমে কোন কিছু পানাহার করে ফেললে, তা রোযার উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করবে না। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি ভুলক্রমে পানাহার করলো, সে যেন তার রোযা পূরণ করে"। (মুসলিম) নাকের মাধ্যমে পেটে পানি প্রবেশ করলে, কোন বিকল্প পদ্ধতিতে খাদ্য গ্রহণ করলে ও প্রয়োজনে শরীরে রক্ত প্রবেশ করালে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ এসবই রোযাদারের জন্য খাদ্য বলে গণ্য।

২। যৌনবাসনা পূরণ করা, যখনই কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যৌনবাসনা পূরণ করবে, তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। তার উপর কাজা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। কাফফারা হলো, কোন ক্রীত দাস-দাসী স্বাধীন করা, তা না পেলে একাধারে দু'মাস রোযা রাখা। কোন শরিয়াতী কারণ যেমন, দু'ঈদের দিন ও আয়্যামে তাশরীক (জিল হজ্জ মাসের ১১,১২ ও ১৩ তারীখ) এ-রোযা রাখা অথবা মানসিক কারণ যেমন, রোগ-ব্যাধি এবং রোযা না ছাড়ার উদ্দেশ্যে সফর করা ইত্যাদি ব্যতীত এই দু'মাসের কোন এক দিনও রোযা ত্যাগ করা যাবে না। কোন কারণ ব্যতীত এক দিনও যদি রোযা বাদ দেয়, তাহলে পুনরায় নতুনভাবে প্রথম থেকে রোযা রাখতে হবে। কারণ এতে ধারাবাহিকতা অপরিহার্য। যদি দু'মাস রোযা রাখতে অক্ষম হয়, তাহলে ৬০জন মিসকিনকে খাওয়াবে।

৩। জাগ্রত অবস্থায় হস্তমৈথুন অথবা স্ত্রীকে স্পর্শ ও চুম্বন করার কারণে বীর্যপাত ঘটলে, রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে, কাফফারা নয়। তবে স্বপ্নদোষে রোযা নষ্ট হয় না।
৪। সিঙ্গী ইত্যাদির মাধ্যমে শরীর থেকে দূষিত রক্ত বের করলে, কিংবা দানের উদ্দেশ্যে বের করলে, রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। তবে স্বল্প পরিমাণ রক্ত বের করা যেমন পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বের করলে, তাতে রোযা নষ্ট হয় না। অনুরূপ নাকের রক্ত প্রবাহের রোগ ও দাঁত উপড়ে ফেলার কারণে রক্ত বের হলে রোযা নষ্ট হবে না।
৫। ইচ্ছাকৃত বমি করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। অনিচ্ছাকৃত হলে নয়।।

উপরোক্ত রোযা নষ্টকারী বস্তুসমূহের দ্বারা তখনই রোযাদারের রোযা নষ্ট হবে, যখন সে জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃত-ভাবে তা গ্রহণ করবে। কিন্তু যদি সে এ সম্পর্কীয় শরিয়তী বিধানের ব্যাপারে অজ্ঞ হয়, অথবা ফজর উদিত হয়েছে কি না ও সূর্যাস্ত হয়েছে কি না ইত্যাদি ব্যাপারে সন্দেহ করতঃ কোন কিছু গ্রহণ করে, তাহলে তার রোযা নষ্ট হয় না। অনুরূপ উক্ত বস্তু নিজ ইখতিয়ারে গ্রহণ করতে হবে। নিরুপায় বা বাধ্যতামূলক ভাবে গ্রহণ করলে, রোযা নষ্ট হবে না বরং তার রোযা বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে এবং তাকে কাযাও করতে হবে না।
৬। হায়েজ (মাসিক রক্ত স্রাব) ও নেফাস- (প্রসবোত্তর রক্ত স্রাব) বের হওয়াও রোযা নষ্টকারী বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। রক্ত দেখার সাথে সাথেই মহিলাদের রোযা নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপ হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় নারীদের রোযা রাখা হারাম। তারা রমযানের পর ত্যাগকৃত রোযা কাযা করবে।

এমন কিছু জিনিস যার দ্বারা রোযা নষ্ট হয় না

১। গোসল করা, সাঁতারকাটা ও প্রচন্ড গ্রীষ্মজনিত তাপ হ্রাস করার নিমিত্তে পানি বা এসি দ্বারা ঠান্ডা উপভোগ করার মত কাজ রোযাদারের রোযা নষ্ট করে না।
২। ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনবাসনা পূরণ করাতে রোযা নষ্ট হয় না।
৩। দাঁতন করা, দিনে যে কোন সময় দাঁতন করা যাবে তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না বরং সেটা মুস্তাহাব কাজ।
৪। যে কোন বৈধ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা সাধন যা খাদ্যের কাজ করে না, তাই যে ইনজেকশন খাদ্যের কাজ করে না তার ব্যবহার এবং চোখে ও কানে ঔষধের ফোটা ফেলা জায়েজ আছে। তাতে রোযা নষ্ট হবে না যদিও ঔষধের স্বাদ গলায় যায়। প্রেসার ইত্যাদির কারণে উদ্ভূত শ্বাসকষ্ট হ্রাস করার লক্ষ্যে স্প্রে ইত্যাদি ব্যবহার করা রোযাদারের জন্য জায়েয আছে। খাদ্যের স্বাদ (পরীক্ষার জন্যে) গ্রহণে রোযা নষ্ট হয় না তবে শর্ত হলো, তার কোন কিছুই যেন পেটে না যায়। কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া রোযাদারের জন্য জায়েজ আছে তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন পানির কোন কিছুই পেটে না যায়। অনুরূপ সুগন্ধি ব্যবহার ও শুঁকাতে কোন ক্ষতি নেই।
৫। মহিলাদের রাতের কোন ভাগে হায়েজ ও নেফাসের রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে, ফজর উদিত হওয়ার পর পর্যন্ত গোসল বিলম্ব করতে পারে। অতঃপর ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে গোসল করবে। জুনবী (বীর্যপাতজনিত) অপবিত্র ব্যক্তির বিধানও অনুরূপ।

কতিপয় সতর্ক বাণী

১। কোন কাফের রমযান মাসে দিনের কোনও অংশে ইসলাম গ্রহণ করলে, যখন ইসলাম গ্রহণ করবে তখন থেকে নিয়ে দিনের অবশিষ্ট অংশটাই পানাহার থেকে বিরত থাকা তার উপর ওয়াজিব। তবে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে না।
২। ফজর উদিত হওয়ার পূর্বেই রাতের যে কোন ভাগে রোযার নিয়্যাত করা অপরিহার্য। তবে এটা শুধু ফরজ রোযার ক্ষেত্রে। নফল রোযার নিয়্যাত ফজর উদিত হওয়ার পরও করা যায় এমনকি প্রভাত হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই। তবে শর্ত হলো কিছু যেন পানাহার না করা হয়।

৩। ইফতারের সময় ইচ্ছামত দোয়া করা রোযাদারের জন্য মুস্তাহাব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ইফতারের সময় রোযাদারের দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না"। (ইবনে মাজা) এই সময় প্রমাণিত দোয়ার মধ্যে হলো,

((ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله)) أبو داود

অর্থাৎ, পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, ধমনীগুলি সিক্ত হয়েছে এবং সাওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইনশাআল্লাহ'। (আবু দাউদ)

৪। রোযার শুরুতে যদি কোন ব্যক্তি দিনের কোন ভাগে রমযান সম্পর্কে অবহিত হয়, তাহলে তাকে তখন থেকেই পানাহার ত্যাগ করতে হবে এবং কাজাও করতে হবে।

৫। যার উপর রোযা কাজা আছে দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে তাড়াতাড়ি রেখে নেওয়া মুস্তাহাব। তবে বিলম্বতেও দোষ নেই। অনুরূপ একাধারে রাখা এবং কেটে কেটে রাখা উভয়ই তার জন্য জায়েজ। কিন্তু দ্বিতীয় রমযান পর্যন্ত বিলম্ব করা জায়েজ নয়।

রোযার সুন্নাত

১। সেহরী খাওয়া, কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সেহরী খাও; কেননা সেহরীতে বরকত নিহিত আছে"। (বুখারী-মুসলিম) শেষ রাত পর্যন্ত বিলম্ব করে সেহরী খাওয়াও সুন্নাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্মাত ইফতারীতে তাড়াতাড়ি ও সেহরীতে বিলম্ব করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা ভালতেই থাকবে।

২। সূর্যাস্তের পর পরেই শীঘ্র ইফতার করা। সদ্যপক্ক খেজুর দিয়ে ইফতার করা সুন্নাত। তা না পেলে শুষ্ক খেজুর, তা না পেলে পানি দিয়ে যদি এসবের কিছুই না পায়, তাহলে যা পাবে তা-ই দিয়ে ইফতার করবে।

৩। রোযা রাখা অবস্থায় বেশী বেশী দোয়া করা বিশেষ করে ইফতারীর সময়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তিন প্রকারের দোয়া গ্রহণ যোগ্য হয়, রোযাদারের দোয়া, অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়া এবং মুসাফিরের দোয়া"।(বায়হাক্বী)

রোযাদারের উচিত রমযান মাসে (আল্লাহর এবাদতের লক্ষ্যে) রাত্রি জাগরণ করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস ও নেকীর আশায় রমযান মাসে রাত্রি জাগরণ করে, তার বিগত সমস্ত গুনাহকে ক্ষমা করা হয়।" (বুখারী-মুসলিম) তাই সকল মুসলমানের উচিত ইমামের সাথে তারাবীহ নামায পূরণ করা। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাযে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথে থাকে, তার (নেকীর খাতায়) পূর্ণ এক রাত্রির এবাদতের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়"।(তিরমিজী,আবু দাউদ নাসায়ী)

রমযান মাসে বেশী বেশী দান করাও উচিত, কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সর্বোত্তম সাদকা হলো রমযান মাসের সাদকা"। (তিরমিজী) অনুরূপভাবে রমযান মাসে বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াতের যত্ন নেওয়া দরকার। কারণ রমযান মাস কুরআনের মাস। কুরআন তেলাওয়াতকারীর জন্য রয়েছে প্রত্যেক অক্ষরের পরিবর্তে নেকী। আর সে নেকী এক থেকে দশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

তারাবীর নামায

রমযান মাসের রাত্রে জামা'আত বদ্ধভাবে কিয়াম করার নামই হচ্ছে তারাবীহ। তারাবীর সময় হলো, এশার পর থেকে নিয়ে ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

তারবীহ নামায আদায় করার ব্যাপারে দারুণভাবে উৎসাহিত করেছেন। (সঠিক মত অনুযায়ী) তারাবীহ নামযের সংখ্যা হলো, ১১রাক'আত। প্রত্যেক দু'রাক'আতে সালাম ফিরা সুন্নাত। ১১রাক'আতের অধিক পড়াতেও দোষ নেই। তারবীর নামাযে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা এবং নামাযকে এতটা লম্বা করা সুন্নাত যাতে মুসল্লীদের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়। ফিৎনার আশংকা না থাকলে মহিলারাও তারাবীর নামাযে উপস্থিত হতে পারবে। তবে শর্ত হলো, পর্দা বজায় রেখে, সৌন্দর্য প্রদর্শন থেকে বিরত থেকে ও সুগন্ধি ব্যবহার না করে বের হতে হবে।

সুন্নাতী রোযা

নিম্নবর্ণিত দিনগুলিতে রোযা রাখার উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছেন।

১। শাওয়াল মাসের ছয় দিন রোযা রাখা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযার পর শাওয়ালের ছয়টি রোযাও রাখলো, সে যেন পুরো বছরটাই রোযা রাখলো"।(মুসলিম)

২। সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা।

৩। প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখা। আর তা হলো, চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারীখ।

৪। আ'শুরার রোযা রাখা, অর্থাৎ, মুহররাম মাসের ১০ তারীখ। ১০ তারীখের একদিন আগে অথবা পরে রোযা রাখা সুন্নাত।

৫। আরাফার দিন রোযা রাখা, অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে।

যে দিনে রোযা রাখা হারাম

১। দু'ঈদে অর্থাৎ, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে।

২। আয়্যামে তাশরীকে অর্থাৎ, জিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারীখে। তবে কেরান অথবা তামাত্তো হজ্জকারী যদি কোরবানীর পশু না পায়, তাহলে তারা উক্ত বিধানের আওতায় আসবে না। (অর্থাৎ, তারা আয়্যা- মে তাশরীকে রোযা রাখতে পারবে)

৩। হায়েজ ও নেফাসের দিনগুলিতে রোযা রাখা।

৪। স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত রোযা রাখা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "স্বামীর উপস্থিতিতে কোন স্ত্রী তার অনুমতি ছাড়া রমযান ব্যতীত অন্য কোন রোযা রাখতে পারে না"। (বুখারী-মুসলিম)

أحكام الحج
হজ্জের বিধান

হজ্জের নির্দেশ ও উহার ফজিলত

হজ্জ প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জীবনে একবারই ওয়াজিব হয়। আর হজ্জ হলো ইসলামের মূল ভিত্তিসমূহের পঞ্চমতম ভিত্তি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)

অর্থাৎ, লোকদের উপর আল্লাহর অধিকার রয়েছে যে, যার এই ঘর পর্যন্ত পৌঁছবার সামর্থ্য আছে, সে যেন হজ্জ সম্পন্ন করে"। (৩ঃ ৯৭) আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

(بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ،
وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)

অর্থাৎ, ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত যথা, এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রেরিত রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমযান মাসের রোযা রাখা ও সামর্থ্যবানের জন্য বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ করা"। (বুখারী)

হজ্জ হলো সৎ কার্যসমূহের অন্যতম কার্য যদ্দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য সাধিত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

(مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এই ঘরের হজ্জ করলো এবং নির্লজ্জ ও শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখলো, সে ব্যক্তি হজ্জ থেকে এমন অবস্থায় বাড়ী প্রত্যাবর্তন করে, যেন সেই দিনই তার মা তাকে নব জাত শিশুরূপে প্রসব করছে"।(মুসনাদ)

হজ্জের শর্তাবলী

জ্ঞানসম্পন্ন প্রত্যেক বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) মুসলমানের উপর হজ্জ ওয়াজিব যদি সে সামর্থ্যবান হয়। সাওয়ারী ও খরচ-খরচার শক্তি থাকলেই সামর্থ্যের প্রমাণ হয়। তাই যদি কেউ সাওয়ারী, যাতায়াত, এবং খাওয়া-পরা ইত্যাদি সহ সমূহ প্রয়োজনীয় জিনিসের মালিক হয়, তাহলে সে সামর্থ্যবান বলে গণ্য হবে। আর এই খরচ তাদের সাংসারিক খরচ থেকে উদ্বৃত্ত ও অতিরিক্ত হতে হবে, যাদের উপর খরচ করা তার জন্য অত্যাবশ্যক। রাস্তার নিরাপত্তা ও শারীরিক সুস্থতাও সামর্থ্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই এমন কোন ব্যাধিগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত যেন না হয়, যা তার হজ্জ আদায়ে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্তাবলী সহ মাহরাম সাথে থাকার শর্তও যুক্ত হবে। অর্থাৎ, হজ্জ যাত্রায় তার সাথে থাকতে হবে তার স্বামীকে অথবা এমন কোন ব্যক্তিকে যার সাথে তার বিয়ে চিরতরে হারাম। আর সে যেন কোন ইদ্দত পালনকারিণী মহিলাও না হয়, কারণ আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে বাড়ী থেকে বের হতে নিষেধ করেছেন। এই সমূহ অন্তরায়ের কোন একটিও যদি কারো ক্ষেত্রে দেখা দেয়, তার উপর হজ্জ ওয়াজিব হবে না।

হজ্জের আদবসমূহ

১। হজ্জ ও উমরাহকারীকে সফরের পূর্বেই হজ্জ ও উমরাহ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানার্জন করে নেওয়া দরকার।

তা সে পড়ে হোক অথবা জিজ্ঞাসাবাদ করে হোক।
২। এমন সৎ সাথীর সাথে যেতে আগ্রহী হওয়া, যে ভাল কাজে তার সহযোগিতা করবে। আর সে যদি কোন আলেম বা তালেবে ইলম হয়, তাহলে অতি উত্তম।
৩। হজ্জে তার উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর নৈকট্য লাভ।
৪। অনর্থক বাক্যালাপ থেকে জিহবাকে সতর্ক রাখা।
৫। দোয়া ও যিকর বেশী বেশী করা।
৬। লোকজনকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা।
৭। মহিলাদের পর্দা-পুশি বজায় রাখা এবং পুরুষদের ভীড় থেকে বাঁচতে চেষ্টা করা।
৮। হাজীদের এই ধারণা পোষণ করা যে, তারা একটি মহান এবাদত সম্পাদনের জন্য বের হয়েছে। এই নয় যে, তারা কোন সাধারন ভ্রমণে বের হয়েছে। কারণ, অনেক হাজী (আল্লাহ তাঁদের হিদায়েত দান করুন) এই ধারণা পোষণ করে যে, হজ্জ, ভ্রমণের একটি সুযোগ মাত্র, তাই তারা বিভিন্ন রকমের ছবি ও চিত্র এই সফরে তুলে।

ইহরাম

হজ্জ ও উমরার কার্যসমূহের মধ্যে প্রবেশ করার নামই হলো ইহরাম। আর ইহরাম বাঁধা তার উপর ওয়াজিব, যে হজ্জ ও উমরাহ আদায়ের ইরাদা করবে। মক্কা ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চল থেকে হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে আগমনকারীকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত মিকাতসমূহের কোন একটি মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে। আর তা হলোঃ
১। মদীনাবাসীদের জন্য "যুলহুলায়ফা" এটা মদীনার সন্নিকটে একটি ছোট জায়গা যাকে বর্তমানে "আবয়ারে আলী" বলা হয়।
২। শামবাসীদের জন্য "আল-জোহফা" এটি রাবেগের একটি গ্রাম। বর্তমানে এখান থেকেই হাজীরা ইহরাম বাঁধে
৩। নাজদবাসীদের জন্য " কারনুল মানাযেল" (আসসায়লুল কাবীর) এটি তায়েফের সন্নিকটে একটি স্থান।
৪। ইয়ামানবাসী ও (ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে আগমনকারী সকল হাজীদের) জন্য "ইয়ালাম লাম"। মক্কা থেকে ৭০ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত একটি স্থান।
৫। ইরাকবাসীদের জন্য " যাতে ইরক"।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত এই মিকাতসমূহ উপরোল্লেখিত তাদের জন্য এবং হজ্জ ও উমরাহ আদায়ের উদ্দেশ্যে আগমনকারী সকলের জন্য। মক্কাবাসী ও আহলে হিল (মিকাত ও হারাম সীমানার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানকারী) নিজ নিজ বাসস্থান থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

ইহরামের সুন্নাত

ইহরামের পূর্বে করণীয় সুন্নাতী বিষয়াদি

১। নখ কাটা, বগলের চুল পরিষ্কার করা, মোচ কাটা, নাভির নিচের চুল পরিষ্কার করা এবং গোসল করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা। তবে সুগন্ধি শরীরে ব্যবহার করবে। কাপড়ে নয়।
২। সিলাইবিহীন একটি লুঙ্গি ও চাদর ব্যবহার করা। মহিলারা পর্দা বজায় রেখে যে কোন কাপড় ব্যবহার করতে পারবে। তবে পর-পুরুষের সামনে নিজের সৌন্দর্যের প্রদর্শনী ও হাত-মুখ খোলা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। হাতমোজা ও (চেহারার সাথে মিলিত কোন) মুখাচ্ছাদন ব্যবহার করবে না।
৩। যদি নামাযের সময় হয়, তাহলে মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা, অন্যথায় ওযুর সুন্নাতের নিয়ত করে দু'রাকআত নামায আদায় করা। অতঃপর নিয়ত করা।

হজ্জ তিন প্রকার

১। হজ্জে তামাত্তো। এর নিয়ম হলো, মিকাত থেকে শুধু উমরার ইহরাম বাঁধবে। অতঃপর হজ্জের সময় উপস্থিত হলে মক্কা থেকেই হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। মিকাতে এই বলে নিয়ত করবে,

لَبَّيْكَ عُمْرَةً مُتَمَتِّعًا بِهَا إِلَى الْحَجِّ

(লাব্বায়িক উমরাতান মুতামাত্তিয়াম বিহা ইলাল হাজ্জি)। সর্বোত্তম হজ্জ হলো, হজ্জে তামাত্তো। বিশেষতঃ যখন হাজী হজ্জ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই মক্কা পৌঁছবে। তাই সর্ব প্রথম উমরাহ আদায় করবে। অতঃপর মক্কা থেকেই এই বলে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে "لَبَّيْكَ حَجًّا" (লাব্বায়কা হাজ্জান) আর এই হজ্জে হাজীকে হাদী (কোরবানীর পশু) অবশ্যই লাগবে। একটি ছাগল এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। আর একটি উট ও গরু সাত ব্যক্তির তরফ থেকে যথেষ্ট হবে।

২। হজ্জে কেরান, অর্থাৎ মিকাত থেকে "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا" (লাব্বায়কা উমরাতান অ হাজ্জান) বলে হজ্জ ও উমরার ইহরাম এক সাথে বাঁধবে। আর এই হজ্জের পদ্ধতি হলো, সর্ব প্রথম উমরাহ আদায় করবে। অতঃপর কোরবানীর দিন পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় অব্যাহত থাকবে। এই হজ্জের আর একটি নিয়ম হলো, উমরার ইহরাম বাঁধার পর উমরাহ আদায় করার পূর্বেই হজ্জকে তার মধ্যে শামিল করে নেবে। সাধারণতঃ তাদেরকেই এই হজ্জ করতে হয়, যাদের হাতে হজ্জের পূর্বে সময় থাকে এত অল্প যে তা উমরাহ সম্পাদন করার পর পুনরায় হজ্জের সময় এলে হজ্জের ইহরাম বাঁধার জন্য যথেষ্ট হয় না। এই জাতীয় হজ্জেও হাদী লাগবে।

৩। হজ্জে ইফরাদ, অর্থাৎ, শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধা। মিকাত থেকে لبيك حجا (লাব্বায়কা হাজ্জান) বলে শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। এই জাতীয় হজ্জে হাদী লাগবে না।

যদি হজ্জকারী আকাশ পথে আগমনকারী হয়, তাহলে সে মিকাতের নিকটে, অথবা তার কিছু পূর্বেই ইহরাম বাঁধতে পারবে যদি মিকাত নির্ণয় করতে অসুবিধা হয়। আর মিকাতে করণীয় যাবতীয় কাজ জাহাজে উঠার পূর্বেই, অথবা জাহাজে উঠে করবে। যেমন, নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, বগলের চুল পরিষ্কার করা এবং ইহরামের কাপড় পরিধান করা ইত্যাদি। অতঃপর মিকাত আসার পূর্বেই অথবা মিকাতের নিকটে পৌঁছে নিয়ত করবে।

নিয়তের পদ্ধতি

১। যদি হজ্জে তামাত্তোর ইচ্ছা করে, তাহলে বলবে, (لَبَّيْكَ عُمْرَةً مُتَمَتِّعًا بِهَا إِلَى الْحَجِّ) (লাব্বায়কা উমরাতান মুতামাত্তিয়াম বিহা ইলাল হাজ্জি)

২। যদি হজ্জে কেরানের ইচ্ছা করে, তাহলে বলবে,(لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا) (লাব্বায়কা উমরাতান অ হাজ্জান)

৩। আর যদি হজ্জে ইফরাদের ইচ্ছা করে তাহলে বলবে, " لَبَّيْكَ حَجًّا " (লাব্বায়কা হাজ্জান)। নিয়ত করার পর থেকে নিয়ে তাওয়াফ আরম্ভ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সব সময় তালবীয়াহ পড়তে থাকা সুন্নাত। আর তালবীয়াহ হলো,

((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ))

(লাব্বায়কা আল্লা-হুম্মা লাব্বায়িক, লাব্বায়কা লা-শারীকা লাকা লাব্বায়িক, ইন্নাল হামদা অনি'মাতা লাকা অল

মুলকা লা-শারীকা লাক।) অর্থাৎ, আমি হাজির হে প্রভু! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত, তোমার কোন অংশীদার নেই। তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। সর্ব প্রকার প্রশংসা এবং নেয়ামতের সামগ্রী সবই তোমার। তোমারই রাজত্ব, তোমার কোন শরীক নেই।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ

ইহরাম অবস্থায় মুহরিমের উপর এমন কিছু জিনিস হারাম হয়ে যায়, যা ইহরাম বাঁধার পূর্বে তার জন্য হালাল ছিল। কারণ, সে একটি মহান এবাদত সম্পাদন করতে চলেছে। তাই নিম্নে বর্ণিত বস্তুসমূহ তার উপর হারাম।

১। মাথা ও শরীরের কোন অংশের চুল নষ্ট করা। তবে ধীরস্থিরভাবে মাথা চুলকানোতে কোন দোষ নেই।
২। নখ কাটা। তবে আপনা আপনি কারো নখ নষ্ট হয়ে গেলে অথবা অসুবিধার কারণে কাটতে হলে, তাতে কোন দোষ নেই।
৩। সুগন্ধি ও সুবাসযুক্ত সাবান ব্যবহার করা।
৪। স্ত্রী সঙ্গম ও তাতে উদ্বুদ্ধকারী জিনিস। যেমন, বিবাহ করা, নারিদের প্রতি যৌন কামনার সাথে দেখা, মহিলার শরীরের সাথে শরীরের স্পর্শ ও চুম্বন করা ইত্যাদি।
৫। হাত মোজা ব্যবহার করা।
৬। শিকার করা।

উপরোক্ত জিনিসগুলি পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই উপরে হারাম। কিছু জিনিস এমন রয়েছে, যা শুধু পুরুষের উপরে হারাম। যেমন,

(ক) সিলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা। তবে প্রয়োজনীয় জিনিস মুহরিম ব্যবহার করতে পারবে। যেমন, বেল্ট, ঘড়ি এবং চশমা ব্যবহার ইত্যাদি।
(খ) কোন এমন জিনিস দিয়ে মাথা ঢাকা, যা মাথার সাথে একেবারে লেগে থাকে। তবে মাথার সাথে লেগে থাকে না এমন জিনিস দ্বারা ছায়া গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই। যেমন, ছাতা, গাড়ীর ছায়া ও তাঁবুর ছায়া ইত্যাদি।
(গ) পায়ের মোজা ব্যবহার করা। তবে জুতা না পেলে চামড়ার মোজা ব্যবহার করতে পারবে।

উপরোক্ত নিষিদ্ধ বস্তুসমূহের কোন একটি যদি কারো দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায়, তবে তার তিনটি কারণ হতে পারে। যেমন,

১। হয় সে জেনে-শুনে বিনা কোন কারণে তা করবে, এমতাবস্থায় সে গুনাহগার বিবেচিত হবে এবং তাকে ফিদয়া দিতে হবে।
২। কিংবা সে কোন প্রয়োজনে তা করবে, এমতাবস্থায় সে গুনাহগার হবে না। তবে তাকে ফিদয়া দিতে হবে।
৩। কিংবা সে মূর্খতার কারণে, অথবা ভুলে, অথবা তাকে করতে বাধ্য করা হবে, এমতাবস্থায় না সে গুনাহগার হবে; আর না তাকে ফিদয়া দিতে হবে।

তাওয়াফ

মসজিদে হারামে পৌঁছে সুন্নাত অনুযায়ী ডান পা প্রথমে রাখবে এবং এই দোয়া পাঠ করতঃ প্রবেশ করবে,

((بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ))

"বিসমিল্লাহি অসসালাতু অসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি। আল্লা-হুম্মাগফিরলি যুনুবি অফতাহ লি আবওয়াবা

রাহমাতিক" অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি। তাঁর রাসূলের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ হোক। হে আল্লাহ ! তুমি আমার গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও। প্রত্যেক মসজিদে প্রবেশ করার সময় উক্ত দোয়া পড়তে হয়। অতঃপর তাওয়াফের উদ্দেশ্যে কা'বা অভিমুখে রওনা হবে। আর তাওয়াফ হলো, আল্লাহর এবাদতের উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফের সাত চক্কর প্রদক্ষিণ করা। আর তাওয়াফ কা'বাকে বাঁয়ে রেখে হাজরে আসওয়াদ থেকে আরম্ভ হবে এবং সেখানেই শেষ হবে। ওযু অবস্থায় তাওয়াফ করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। তাওয়াফের নিয়ম হলো,

১। "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলে ডান হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করবে। আর সম্ভব হলে তাকে চুমা দেবে। হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেওয়া সম্ভব না হলে, হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করে হাতে চুমা দেবে। তবে স্পর্শ করা ও চুমা দেওয়া কোনটাই সম্ভব না হলে, তাকে সম্মুখ করে "আল্লাহু আকবার" বলে হাত দ্বারা তার দিকে ইশারা করবে। তবে হাতে চুমা দেবে না। অতঃপর কা'বাকে বাঁয়ে রেখে তাওয়াফ আরম্ভ করবে এবং সাধ্যানুসারে দোয়া ও কোরআন তেলাওয়াত ইচ্ছামত করতে থাকবে। হজ্জকারী আপন ভাষায় নিজের জন্য ও অন্য যারই জন্য চাইবে, দোয়া করতে পারবে। তাওয়াফের জন্য কোন নির্দিষ্ট দোয়া নেই।

২। রুকনে ইয়ামানীর নিকটে পৌঁছে সম্ভব হলে "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলে হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করবে। তবে হাতে চুমা দেবে না। যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তার দিকে কোন ইশারা না করে তাওয়াফ অব্যাহত রাখবে এবং সেখানে তাকবীরও পড়বে না। হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছে এই আয়াতটি পড়বে,

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

(রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁউ অ ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁউ অ ক্বিনা আযাবান্নার) অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে এই দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান করো এবং পরকালেও আমাদিগকে কল্যান দাও। আর আগুনের আযাব হতে আমাদিগকে রক্ষা করো।

৩। হাজরে আসওয়াদের নিকটে পৌঁছে সম্ভব হলে হাত দ্বারা তাকে স্পর্শ করবে। কিন্তু সম্ভব না হলে "আল্লাহু আকবার" বলে হাত উঠিয়ে তার দিকে ইশারা করবে। এই ভাবে সাতটি তাওয়াফের মধ্যে একটি তাওয়াফ সুসম্পন্ন হবে।

৪। প্রথম তাওয়াফের ন্যায় অন্যান্য তাওয়াফগুলিও সুসম্পন্ন করবে। প্রথম তাওয়াফে কৃত যাবতীয় করণীয় বাকী সমস্ত তাওয়াফেও করবে। যখনই হাজরে আসওয়াদের নিকটে আসবে, তখনই তাকবীর পড়বে। সপ্তম তাওয়াফের শেষেও তকবীর পড়বে। প্রথম তাওয়াফের তিনটি চক্করে রামল করবে। অবশিষ্ট চারটি চক্করে হাঁটবে। আর রামল হলো, ছোট ছোট কদমে বা পদক্ষেপে দ্রুত চলা। পুরা সাত চক্করের এই প্রথম তাওয়াফে ইযতিবা করাও সুন্নাত। আর ইযতিবা হলো, পরিহিত চাদরের মধ্যভাগকে ডান কাঁধের নীচে দিয়ে চাদরের উভয় কোণ বাম কাঁধের উপর ধারণ করা। হজ্জ ও উমরাহকারী সর্ব প্রথম যে তাওয়াফ করবে, সেই তাওয়াফেই শুধু রামল ও ইযতিবা হবে।

তাওয়াফের পর

তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকআত নামায আদায় করা সুন্নাত। মাকামে ইবরাহীম তার ও কা'বার মধ্যস্থলে থাকবে। প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা সহ "কুলয়া আয়্যোহাল কাফিরুন" পড়বে। আর দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা সহ "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" পড়বে। অত্যধিক ভীড়ের কারণে যদি মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে মসজিদের যে কোন স্থানে পড়ে নেবে। তাওয়াফ ও নামাযের পর খুব বেশী বেশী যমযমের পানি পান করা সুন্নাত।

সাঈ

যমযমের পানি পান করে সাফা-মারওয়া অভিমুখে যাত্রা করবে। সাফায় পৌঁছে এই আয়াতটি পড়বে,

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾

"ইন্নাসসাফা অল মারওয়াতা মিন শাআ'য়িরিল্লাহ" অতঃপর সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে কেবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও ইচ্ছামত দোয়া করবে। যেমন এই দোয়াটি পড়বে,

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَإِلَهَ إِلاَّاللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ))

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ অহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু, অলাহুল হামদু য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু অহুওয়া আলা কুল্লি শায়িন ক্বাদীর। লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ অহদাহু, আনজাযা ওয়া'দাহু, অ নাসারা আবদাহু, অ হাযামাল আহযাবা অহদাহু" অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্যিকার উপাস্য নেই, তিনি মহান। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি এক ও একক তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাশীল। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই তিনি এক ও একক। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দার সহযোগিতা করেছেন এবং সৈন্যদেরকে তিনিই পরাজিত করেছেন। উক্ত দোয়াটি তিনবার পড়বে এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দোয়া করবে।

দোয়া শেষ করে সাফা পাহাড় থেকে অবতরণ করতঃ মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হবে। যখন সবুজ বাতির নিকটে পৌঁছবে, তখন সাধ্যানুসারে দ্বিতীয় সবুজ বাতি পর্যন্ত দৌড়বে। তবে দৌড়তে গিয়ে কারো কষ্ট যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর দৌড় শুধু পুরুষদের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়। মারওয়ায় পৌঁছে কেবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে সাফা পাহাড়ে পঠিত সমস্ত দোয়া পাঠ করবে। এইভাবে সাত চক্করের এক চক্কর পূরণ হবে। দোয়ার পর মারওয়া থেকে অবতরণ করতঃ সাফার দিকে অগ্রসর হবে এবং প্রথম চক্করে কৃত সমস্ত করণীয় অন্যান্য বাকী চক্করেও করবে। সাঈ করাকালীন বেশী বেশী দোয়া করা সুন্নাত। সাঈর পর তামাত্তো হজ্জকারী মাথা নেড়া করে উমরাহ সমাপ্তি করতঃ সাধারন পোশাক পরিধান করে হালাল হয়ে যেতে পারবে। অতঃপর জিল হজ্জ মাসের ৮ তারীখে যোহরের নামাযের পূর্বেই মক্কায় নিজ বাসস্থান থেকেই হজ্জের ইহরাম বাঁধবে এবং উমরার ইহরাম বাঁধার সময় কৃত যাবতীয় করনীয় করবে। অতঃপর (লাব্বায়কা হাজ্জান) বলে হজ্জের নিয়ত করে তালবীয়াহ পড়তে পড়তে মীনা অভিমুখে রওনা হবে। সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায কসর করতঃ চার রাকআত নামাযগুলি দু'রাকআত করে পড়বে।

আরাফার দিনে করণীয় কাজ

১। সূর্যোদয়ের পর হাজী আরাফা অভিমুখে রওনা হবে এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে। সূর্য ঢলে গেলে যোহর ও আসরের নামায এক সাথে কসর করে পড়বে। নামাযের পর যিকির, দোয়া ও তালবীয়াহ পড়াতে মনোনিবেশ করবে। নম্র ও বিনতি সহকারে খুব বেশী বেশী দোয়া করবে। আল্লাহর নিকট নিজের ও অন্যান্য সকল মুসলমানদের জন্য কল্যাণ কামনা করবে ও স্বীয় চাহিদা অনুযায়ী প্রার্থনা করবে। দোয়ার সময় হাত উঠানো মুস্তাহাব। আরাফায় অবস্থান হজ্জের রুকনসমূহের এমন একটি রুকন যে, যদি কেউ তা ত্যাগ করে, তবে তার হজ্জ শুদ্ধ হবে না। আরাফায় অবস্থানের সময় হলো, ৯ তারীখের সূর্যোদয়ের পর থেকে নিয়ে ১০ তারীখের ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত। যে ব্যক্তি দিন ও রাতের কোন অংশে কিছু সময়ের জন্যেও সেখানে

অবস্থান করবে, তার হজ্জ্ব পরিপূর্ণ বলে গণ্য হবে। তবে হাজীকে এব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, সে আরাফার সীমানার অভ্যন্তরেই আছে।

২। আরাফার দিন সূর্যাস্তের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ধীরস্থির ও নম্রতা সহকারে উচ্চ স্বরে তালবীয়াহ পড়তে পড়তে মুজদালেফা অভিমুখে রওনা হবে। মুজদালেফায় পৌঁছা মাত্র সর্ব প্রথম মাগরিব ও এশার নামায এক সাথে কসর করে পড়বে। নামাযের পর খাবার ইত্যাদির আয়োজন করতে পারবে। তবে শীঘ্র ঘুমিয়ে যাওয়া উত্তম। যাতে ফজরের নামাযের জন্য চাঙ্গা হয়ে উঠতে সক্ষম হয়।

১০ তারীখ ঈদের দিন

১। ফজরের সময় হলে নামায আদায় করে সেই স্থানেই বসে খুব ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত অত্যধিক যিকির ও তেলাওয়াতে মনোনিবেশ করবে।

২। সাতটি ছোট কাঁকর বেছে নিয়ে সূর্যোদয়ের আগেই তালবীয়াহ পাঠরত অবস্থায় মীনা অভিমুখে রওনা হবে।

৩। জামরায়ে আকাবা (বড় জামরা) পর্যন্ত পৌঁছা অবধি তালবীয়াহ অব্যাহত রাখবে। সাতটি কাঁকর একটি একটি করে মারবে। প্রত্যেক কাঁকর মারার সময় "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি উচ্চারণ করবে।

৪। কাঁকর মারার পর তামাত্তো ও কেরান হজ্জ্বকারী কোরবানী করবে। কোরবানীর গোশত খাওয়া, হাদিয়া করা ও সাদকা করা সবকিছু তার জন্য মুস্তাহাব।

৫। কোরবানীর পর সম্পূর্ণ মাথা নেড়া করবে, অথবা খাটো করবে। তবে নেড়া করা উত্তম। মহিলারা প্রত্যেক চুলের গোছা থেকে এক আঙ্গুল(তিন সেন্টি মিটার) পরিমান চুল খাটো করবে। এর পর সাধারণ পোশাক পরিধান করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, চুল-নখ কাটা সহ যা কিছু তার উপর নিষিদ্ধ ছিলো সব বৈধ হয়ে যাবে। তবে তাওয়াফ না করা পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করতে পারবে না। কিন্তু গোসল করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া, সুগন্ধি ব্যবহার করা ও সাধারণ পোশাক পরিধান করা তার জন্য মুস্তাহাব।

৬। অতঃপর হজ্জের তাওয়াফ (তাওয়াফে ইফাযাহ)-এর উদ্দেশ্যে কা'বা অভিমুখে রওনা হবে। কা'বার সাত চক্কর সমাপ্ত করে দু'রাকআত নামায আদায় করে সাঈর জন্য সাফা-মারওয়ার দিকে রওনা হয়ে সাত বার সাঈ করবে। সাঈর পর স্ত্রী সহ সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তু তার জন্য হালাল হয়ে যাবে, যা ইহরাম অবস্থায় তার উপর হারাম ছিলো।

৭। জিল হজ্জ্ব মাসের ১১ ও ১২ তারীখের রাতে মীনায় অবস্থান করা প্রত্যেক হাজীর উপর অপরিহার্য। আর যে বিলম্ব করবে সে, ১৩ তারীখের রাতও মীনায় কাটাবে। মীনাতে রাত্রিবাস বলতে, রাতের বেশীর ভাগ অংশটা সেখানে কাটানো।

উপরোক্ত পালনীয় কাজগুলি পর্যায়ক্রমে করা সুন্নাত ও উত্তম। যেমন, প্রথমে কাঁকর নিক্ষেপ করা। অতঃপর কোরবানী করা। অতঃপর মাথা নেড়া করা। অতঃপর তাওয়াফ করা। কিন্তু যদি এর মধ্যে কোনটি আগে-পিছে হয়ে যায়, তবে তাতে কোন দোষ নেই।

১১তারীখ

এই দিনে প্রত্যেক হাজীকে প্রত্যেক জামরাকে কাঁকর মারতে হবে। সূর্য মধ্যাহ্ন গগন হতে পশ্চিমে গড়ে যাওয়ার পর থেকেই কাঁকর মারা আরম্ভ হবে। এর পূর্বে বৈধ হবে না। সর্ব প্রথম ছোট জামরাতে কাঁকর মারবে। অতঃপর মধ্যমটাকে। অতঃপর বড়টাকে। সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যে কোন সময় কাঁকর মারা যায়। কাঁকর মারার পদ্ধতি হলোঃ

১। সাথে ২১টি কাঁকর নিয়ে ছোট জামারার নিকটে গিয়ে সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেক কাঁকর নিক্ষেপের সময় "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি উচ্চারণ করতে হবে এবং কাঁকর যেন হওযের মধ্যে পতিত হয় এ

ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। আর কাঁকর একটি একটি করে মারতে হবে। কাঁকর মারার পর ডান দিকে একটু সরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে দোয়া করা সুন্নাত।

২। অতঃপর মধ্যম জামরার দিকে অগ্রসর হয়ে সেখানেও প্রত্যেক নিক্ষেপের সময় "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি উচ্চারণ করতঃ পরপর সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করবে। অতঃপর একটু বাঁ দিকে সরে গিয়ে প্রথম বারের ন্যায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত দোয়া করবে।

৩। অতঃপর জামরায়ে আকাবার দিকে অগ্রসর হয়ে প্রত্যেক নিক্ষেপের সময় "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি উচ্চারণ করতঃ পর পর সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। তবে এখানে দাঁড়িয়ে দোয়া করবে না।

১২ তারীখ

১। ১১তারীখে কৃত যাবতীয় করণীয় অনুরূপ ১২ তারিখেও করবে। যদি হাজী বিলম্ব করতে ও ১৩ তারীখ পর্যন্ত থাকতে চায়,আর এটাই উত্তম। তাহলে সে ১১ ও ১২ উভয় দিনে কৃত যাবতীয় কাজ ১৩ তারীখেও করবে।

২। ১২ তারীখে অথবা ১৩ তারীখে কাঁকর মারার পর প্রত্যেক হাজী কা'বা শরীফের তাওয়াফ (বিদায়ী তাওয়াফ)-এর উদ্দেশ্যে রওনা হবে। কা'বা শরীফের সাত চক্কর তাওয়াফ সম্পাদন করার পর মাক্বামে ইবরাহীমে দু'রাকআত নামায আদায় করবে। (ভীড়ের কারণে) সেখানে নামায আদায় করা সম্ভব না হলে, মসজিদের যে কোন স্থানে তা আদায় করে নেবে। ঋতুমতী এবং নেফাসওয়ালী মহিলাদের উপর বিদায়ী তাওয়াফ নেই। তাদেরকে এতে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

৩। বিদায়ী তাওয়াফের পর হাজীগণ অন্য কোন কিছুতে ব্যস্ত না হয়ে যিকর, দোয়া ও উপকারী উপদেশাদি শ্রবণে সমস্ত সময়টাকে ব্যস্ত রেখে মক্কা ত্যাগ করবে। তবে স্বল্প সময়ের জন্য অবস্থানে কোন দোষ নেই। যেমন সঙ্গী-সাথীর অপেক্ষা করা, অথবা সামানাদি বয়ে আনতে বিলম্ব হওয়া ও রাস্তার প্রয়োজনীয় কোন জিনিস ক্রয় করা ইত্যাদি।

হজ্জের রুকনসমূহ

১। ইহরাম বাঁধা।

২। আরাফায় অবস্থান করা।

৩। তাওয়াফে ইফাযা (ঈদের দিনের তাওয়াফ)। করা।

৪। সাফা মারওয়ার সাঈ করা।

উপরোক্ত রুকনসমূহের কোন একটিও যদি কেউ ত্যাগ করে, তবে তার হজ্জ হবে না।

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ

১। মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধা।

২। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা। যদি দিনে অবস্থান করে।

৩। ফজর উদিত হয়ে খুব ফর্সা হওয়া পর্যন্ত মুযদালেফায় রাত্রিবাস করা। তবে দুর্বল ব্যক্তিগণ ও মহিলারা অর্ধেক রাতের পর প্রত্যাবর্তন করতে পারবে।

৪। তাশরীকের রাতগুলিতে মীনায় অবস্থান করা।

৫। তাশরীকের দিনগুলিতে প্রত্যেক জামরাতে কাঁকর মারা।

৬। মাথা নেড়া করা অথবা চুল খাটো করা।

৭। বিদায়ী তাওয়াফ করা।

যে ব্যক্তি ওয়াজিব সমূহের কোন কিছুকে ত্যাগ করবে, তাকে একটি ছাগল অথবা এক সপ্তমাংশ গাই, বা উট যবেহ করে হারাম শরীফের ফকির মিসকিনদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে।

মসজিদে নববীর যিয়ারত

নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে নববীর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। কারণ, মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের তুলনায় মসজিদে নববীতে এক ওয়াক্ত নামায এক হাজার নামাযের চেয়েও উত্তম। আর এই মসজিদের যিয়ারত যে কোন সময় করা যায়, এর জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। আর মসজিদে নববীর যিয়ারত হজ্জের কোন অংশও নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মুসলমান এই মসজিদে থাকবে তার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদ্বয়, আবু বাকার ও উমার- (আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন)- এর কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। কবরের যিয়ারত পুরুষদের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়। নবীর হুজরার কোন কিছুকে স্পর্শ করা, অথবা তার তাওয়াফ করা ও দোয়া করাকালীন তার দিকে মুখ করা কারো জন্যে বৈধ নয়।

أحكام النكاح

বিবাহের বিধান

বিবাহের শর্তাবলী

১। স্বামী-স্ত্রীর সন্তুষ্টি। অতএব কোন পুরুষকে এমন নারীর সাথে বিবাহ করতে বাধ্য করা যাবে না, যাকে সে চায় না। অনুরূপ কোন নারীকে এমন কোন পুরুষের সাথে বিবাহ করতে বাধ্য করা যাবে না, যাকে সে চায় না। নারীর সন্তুষ্টি ব্যতীত তার বিবাহ দেওয়াকে ইসলাম নিষেধ করেছে। যখন নারী কোন পুরুষের সাথে বিবাহ করতে অসম্মতি প্রকাশ করবে, তখন এ ব্যাপারে কেউ তাকে বাধ্য করতে পারবে না, যদিও সে তার পিতা হয়।

২। ওয়ালী। ওয়ালী ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "ওয়ালী ব্যতীত বিবাহ নেই"।(আবু দাউদ ও তিরমিজী) সুতরাং যদি কোন নারী ওয়ালী ব্যতীতই বিবাহ করে, তাহলে তার বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। চাই সে নিজে নিজেই বিয়ে করুক, কিংবা অন্য কাউকে অভিভাবক নিযুক্ত করে বিয়ে করুক। আর কোন কাফির কোন মুসলিম নারীর অভিভাবক হতে পারে না। যার ওয়ালী নেই, তার ওয়ালী হবে দেশের বাদশাহ। আর ওয়ালী হলো, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিসম্পন্ন নারীর আসবা জাতীয় আত্মীয়- স্বজন। যেমন, পিতা ও পিতা যাকে অসীয়ত করবে। অতঃপর দাদা। এইভাবে পর্যায়ক্রমে উর্ধ্বে যাবে। যে যত নিকটতর হবে, তার তত অগ্রাধিকার থাকবে। অতঃপর পুত্র ও পুত্রের পুত্র এইভাবে পর্যায়ক্রমে নিম্নে যাবে। অতঃপর আপন ভাই। তারপর বৈমাত্রেয় ভাই। অতঃপর আপন ভায়ের ও বৈমাত্রেয় ভায়ের পুত্ররা। যে যত নিকটতর হবে, তার তত অগ্রাধিকার থাকবে। অতঃপর আপন চাচা। তারপর বৈমাত্রেয় চাচা। অতঃপর চাচাদের পুত্ররা। অতঃপর বাপের চাচা ও তার ছেলেরা। তারপর দাদার চাচা ও তার ছেলেরা। প্রত্যেক ওয়ালীর কর্তব্য হলো, বিবাহের পূর্বে মেয়ের নিকট অনুমতি নেওয়া। আর ওয়ালীর শর্ত আরোপ করার মধ্যে কৌশল হলো, ব্যভিচারের উপকরণাদি বন্ধ করে দেওয়া। কারণ ব্যভিচারী এ ব্যাপারে অক্ষম নয় যে, সে মহিলাকে বলবে, তুমি তোমাকে এতটা মহরের বিনিময়ে আমার সাথে বিবাহ করিয়ে দাও। অতঃপর আপন দু'জন সঙ্গী-সাথী, অথবা অন্য দু'জন কাউকে এই বিয়ের সাক্ষীরূপে রেখে নেবে।

৩। দু'জন সাক্ষীদাতা। বিবাহে দুই বা দুয়ের অধিক ন্যায়পরায়ণ মুসলমানের উপস্থিত থাকা অত্যাবশ্যক। অনুরূপ এই দু'জনকে বিশ্বস্ত এবং চুরি, ব্যভিচার, শারাবপান ইত্যাদি কাবিরাহ গুনাহ থেকে মুক্ত ব্যক্তি হতে হবে। বিবাহের শব্দ হলো, স্বামী, অথবা তার অভিভাবক বলবে, "তোমার মেয়েকে, অথবা যার সম্পর্কে তোমাকে অসীয়ত করা হয়েছে, তাকে আমার সাথে বিবাহ দিয়ে দাও" অতঃপর ওয়ালী বলবে, "আমার মেয়েকে, অথবা অমুককে আমার তত্ত্বাবধানে তোমার সাথে বিবাহ দিয়ে দিলাম"। অতঃপর স্বামী বলবে, "আমার সাথে তার বিবাহকে গ্রহণ করলাম" স্বামী তার তরফ থেকে কাউকে উকীল নিযুক্ত করতে চাইলে, তা করতে পারে।

৪। মহর প্রদান। আর মহর কম হওয়াই হলো শরীয়তের বিধান। তাই মহর যত কম হবে ও সাধ্যানুসারে হবে, ততই উত্তম। মহরকে সেদাকও বলা হয়। বিবাহের সময় মহরের উল্লেখ করা এবং তখনই তা আদায় করে দেওয়া সুন্নাত। অনুরূপ সম্পূর্ণ মহর পরে আদায় করা, বা কিছু অংশ পরে আদায় করা ইত্যাদিতেও কোন দোষ নাই। যদি স্বামী স্ত্রীকে তার সাথে যৌনবাসনায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে স্ত্রী অর্ধেক মহরের অধিকারিনী হবে। কিন্তু যদি যৌনবাসনায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বে স্বামী মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সম্পূর্ণ মহর ও মিরাস উভয়েরই সে মালিক হবে।

বিবাহের পর যা আরোপিত হয়

১। ব্যয়ভার। সঠিক প্রচলিত পন্থায় স্ত্রীর খাওয়া-পরা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। যদি সে এসব আদায়ে কৃপণতা করে, তাহলে সে গুনাগার বিবেচিত হবে। আর এমতাবস্থায় স্ত্রী তার মাল থেকে প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ নিতে পারবে। অথবা কারো নিকট থেকে ঋণ নেবে, যা স্বামী পরিশোধ করবে। ওলীমাহ কারও ব্যয়ভারের অন্তর্ভুক্ত। আর ওলীমাহ হলো, বিবাহের দিনে স্বামী কর্তৃক আয়োজিত খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, যাতে লোকদের আমন্ত্রণ করা হয়। এটা একটি এমন নির্দেশিত সুন্নাত, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নিজে করেছেন এবং করতে নির্দেশও দিয়েছেন।

২। উত্তরাধিকার। যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলাকে সঠিক পন্থায় বিবাহ করবে, তখনই তাদের উভয়ের মধ্যে ওয়ারেসীস্বত্ব স্থাপিত হয়ে যাবে। এর প্রমাণ আল্লাহতা'য়ালার বাণী। তিনি বলেন,

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ (النساء ١٢)

অর্থাৎ, "আর তোমাদের স্ত্রীগণ যা কিছু রেখে গেছে, তার অর্ধেক তোমরা পাবে, যদি তারা নিঃসন্তান হয়। আর সন্তানশীলা হলে, রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ তোমরা পাবে তখন যখন তাদের কৃত অসীয়ত পূরণ করা হবে এবং যে ঋণ অনাদায় রেখে গেছে, তা আদায় করা হবে। আর তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশের অধিকারিণী হবে, যদি তোমরা নিঃসন্তান হও। আর তোমাদের সন্তান থাকলে তারা পাবে আটভাগের একভাগ। এটাও তখনই কার্যকরী হবে, যখন তোমাদের অসীয়ত পূরণ করা হবে, আর যে ঋণ রেখে গেছ, তা আদায় করা হবে"। (৪ঃ ১২) এ ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীর সাথে যৌনবাসনায় লিপ্ত হোক বা না হোক, তাকে নিয়ে নির্জনে থেকে থাকুক বা না থেকে থাকুক, তাতে কোন কিছু এসে যায় না।

বিবাহের সুন্নাত ও আদব

১। বিবাহের ঘোষণা ও প্রচার করা। অনুরূপ স্বামী-স্ত্রীর জন্য দো'য়া করা সুন্নাত। সুতরাং তাদের উভয়ের জন্য এই দোয়াটি করবে,

((بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ))

(বারাকাল্লাহু লাকা অবারাকা আলায়কা, অজামাআ' বায়নাকুমা ফি খায়রিন) অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় বরকতে ধন্য করুন এবং তোমাদের উভয়কে মঙ্গলের সাথে প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

২। যৌনবাসনায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বে নিম্নের দোয়াটি পড়া সুন্নাত।

((بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا))

(বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা থেকে বাঁচাও এজান্নিব নাশ্শায়তানা অজান্নিবিশ্শায়তানা মা রাযাক্ব তানা) অর্থাৎ, আল্লাহর নাম নিয়ে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচাও এবং আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তানের আক্রমন থেকে বাঁচাও।

৩। স্বামী-স্ত্রীর মিলনের গোপন রহস্য প্রকাশ করা উভয়ের জন্য হারাম।

৪। ঋতু ও নিফাস অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম, যতক্ষণ না সে গোসল করে পবিত্র অর্জন করে নেয়।

৫। নারীর পায়খানার দ্বার যৌনসঙ্গমের সময় ব্যবহার করা স্বামীর উপর হারাম। কারণ, এটা এমন কবিরাহ

রাহমাতিক" অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি। তাঁর রাসূলের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ হোক। হে আল্লাহ ! তুমি আমার গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও। প্রত্যেক মসজিদে প্রবেশ করার সময় উক্ত দোয়া পড়তে হয়। অতঃপর তাওয়াফের উদ্দেশ্যে কা'বা অভিমুখে রওনা হবে। আর তাওয়াফ হলো, আল্লাহর এবাদতের উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফের সাত চক্কর প্রদক্ষিণ করা। আর তাওয়াফ কা'বাকে বাঁয়ে রেখে হাজরে আসওয়াদ থেকে আরম্ভ হবে এবং সেখানেই শেষ হবে। ওযু অবস্থায় তাওয়াফ করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। তাওয়াফের নিয়ম হলো,

১। "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলে ডান হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করবে। আর সম্ভব হলে তাকে চুমা দেবে। হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেওয়া সম্ভব না হলে, হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করে হাতে চুমা দেবে। তবে স্পর্শ করা ও চুমা দেওয়া কোনটাই সম্ভব না হলে, তাকে সম্মুখ করে "আল্লাহু আকবার" বলে হাত দ্বারা তার দিকে ইশারা করবে। তবে হাতে চুমা দেবে না। অতঃপর কা'বাকে বাঁয়ে রেখে তাওয়াফ আরম্ভ করবে এবং সাধ্যানুসারে দোয়া ও কোরআন তেলাওয়াত ইচ্ছামত করতে থাকবে। হজ্জকারী আপন ভাষায় নিজের জন্য ও অন্য যারই জন্য চাইবে, দোয়া করতে পারবে। তাওয়াফের জন্য কোন নির্দিষ্ট দোয়া নেই।

২। রুকনে ইয়ামানীর নিকটে পৌঁছে সম্ভব হলে "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলে হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করবে। তবে হাতে চুমা দেবে না। যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তার দিকে কোন ইশারা না করে তাওয়াফ অব্যাহত রাখবে এবং সেখানে তাকবীরও পড়বে না। হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছে এই আয়াতটি পড়বে,

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

(রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁউ অ ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁউ অ ক্বিনা আযাবান্নার) অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে এই দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান করো এবং পরকালেও আমাদিগকে কল্যাণ দাও। আর আগুনের আযাব হতে আমাদিগকে রক্ষা করো।

৩। হাজরে আসওয়াদের নিকটে পৌঁছে সম্ভব হলে হাত দ্বারা তাকে স্পর্শ করবে। কিন্তু সম্ভব না হলে "আল্লাহু আকবার" বলে হাত উঠিয়ে তার দিকে ইশারা করবে। এই ভাবে সাতটি তাওয়াফের মধ্যে একটি তাওয়াফ সুসম্পন্ন হবে।

৪। প্রথম তাওয়াফের ন্যায় অন্যান্য তাওয়াফগুলিও সুসম্পন্ন করবে। প্রথম তাওয়াফে কৃত যাবতীয় করণীয় বাকী সমস্ত তাওয়াফেও করবে। যখনই হাজরে আসওয়াদের নিকটে আসবে, তখনই তাকবীর পড়বে। সপ্তম তাওয়াফের শেষেও তকবীর পড়বে। প্রথম তাওয়াফের তিনটি চক্করে রামল করবে। অবশিষ্ট চারটি চক্করে হাঁটবে। আর রামল হলো, ছোট ছোট কদমে বা পদক্ষেপে দ্রুত চলা। পুরা সাত চক্করের এই প্রথম তাওয়াফে ইযতিবা করাও সুন্নাত। আর ইযতিবা হলো, পরিহিত চাদরের মধ্যভাগকে ডান কাঁধের নীচে দিয়ে চাদরের উভয় কোণ বাম কাঁধের উপর ধারণ করা। হজ্জ ও উমরাহকারী সর্ব প্রথম যে তাওয়াফ করবে, সেই তাওয়াফেই শুধু রামল ও ইযতিবা হবে।

তাওয়াফের পর

তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকআত নামায আদায় করা সুন্নাত। মাকামে ইবরাহীম তার ও কা'বার মধ্যস্থলে থাকবে। প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা সহ "কুলয়া আয়্যোহাল কাফিরুন" পড়বে। আর দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা সহ "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" পড়বে। অত্যধিক ভীড়ের কারণে যদি মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে মসজিদের যে কোন স্থানে পড়ে নেবে। তাওয়াফ ও নামাযের পর খুব বেশী বেশী যমযমের পানি পান করা সুন্নাত।

আওতায় পড়ে।

(চ) ভায়ের মেয়ে বলতে আপন ভায়ের মেয়ে, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় ভায়ের মেয়ে এবং এদের ছেলে ও মেয়েদের মেয়ে এইভাবে যতই নিচে যাওয়া যাবে।

(ছ) বোনের মেয়ে বলতে আপন বোনের মেয়ে, বৈপিত্রেয়ী ও বৈমাত্রেয়ী বোনের মেয়ে এবং এদের ছেলে ও মেয়েদের মেয়ে ও এইভাবে যতই নিচে যাওয়া যাবে।

২। দুধ সম্পর্কের কারণে যে সমস্ত মহিলাদের সাথে বিবাহ করা হারাম। এরা বংশীয় সম্পর্কের কারণে হারাম কৃত নারীদের মতই। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ))

অর্থাৎ, "দুধ পানেও ঐরূপ হারাম হয়ে যায়, যেরূপ বংশীয় সম্পর্কের কারণে হারাম হয়ে যায়"। তবে দুধ পানে হারাম হওয়ার কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন, (ক) কমপক্ষে পাঁচবার, অথবা পাঁচাধিক বার দুধ পান করতে হবে। তাই যদি কোন শিশু চারবার দুধ পান করে, তাহলে দুধদানকারিণী মহিলা শিশুর মা বলে গণ্য হবে না। (খ) এই দুধ পান দুধ ছাড়ার পূর্বেই হতে হবে। অর্থাৎ, পাঁচবার দুধ পান করা, দুধ ছাড়া সময়ের পূর্বেই হতে হবে। সুতরাং যদি দুধ পান দুধ ছাড়া সময়ের পরে হয়, কিংবা কিছু আগে ও কিছু পরে হয়, তাহলে এই দুগ্ধদাত্রী মহিলা শিশুর মা বলে গণ্য হবে না। দুধ পানের শর্তাবলী পরিপূর্ণ হলে, শিশু দুধদানকারিণীর ছেলে বলে পরিগণিত হবে এবং মহিলার ছেলে-মেয়েরা তার ভাই-বোন বলে গণ্য হবে। তাতে তারা এর আগের হোক কিংবা পরের হোক। মহিলার স্বামীর ছেলে-মেয়েরাও তার ভাই-বোন বলে গণ্য হবে। তাতে তারা ঐ মহিলারই হোক, যার সে দুধ পান করেছে, কিংবা অন্য মহিলার হোক। এখানে একটি জিনিস জেনে রাখা অত্যাবশ্যক যে, দুধ পানকারী শিশুর সন্তানাদি ব্যতীত তার আত্মীয় স্বজনদের সাথে দুধ পানের কোন সম্পর্ক নেই। দুধ পান তাদের উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করবে না।

৩। বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যে সমস্ত মহিলাদেরকে বিবাহ করা হারাম, তা হলো নিম্নরূপ,

(ক) পিতা ও দাদাদের স্ত্রীগণ, যখনই কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করবে, তখনই সেই মহিলা তার ছেলে, ছেলের ছেলে এবং মেয়ের ছেলের উপর হারাম হয়ে যাবে।তাতে সে তার সাথে সহবাস করুক, বা না করুক।

(খ) ছেলেদের স্ত্রীগণ, যখনই কোন ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করবে, তখনই সেই নারী তার পিতা ও দাদা-নানাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে। তাতে সে যৌনবাসনায় লিপ্ত হোক, বা না হোক।

(গ) স্ত্রীর মা ও দাদী-নানী, যখনই কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করবে, তখনই মহিলার মা ও দাদী-নানী তার উপর হারাম হয়ে যাবে। কেবল বিয়ে হলেই হবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হোক বা না হোক।

(ঘ) স্ত্রীর মেয়েরা এবং স্ত্রীর ছেলের ও মেয়ের মেয়েরা, যখনই কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করবে এবং তাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও স্থাপিত হবে, তখনই মহিলার মেয়েরা ও ছেলের ও মেয়ের মেয়েরা তার উপর হারাম হয়ে যাবে। তাতে এই মেয়েরা আগের স্বামীর হোক, কিংবা পরের স্বামীর হোক। তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পূর্বেই যদি তারা একে অপর থেকে ভিন্ন হয়ে যায়, তাহলে স্ত্রীর মেয়েরা স্বামীর জন্য হারাম হবে না।

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যাদের সাথে বিবাহ করা হারাম, তারাও কয়েক প্রকারের। যেমন,

১। স্ত্রীর বোন, ফুফু ও খালা যতক্ষণ না মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে স্ত্রী স্বামীর থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং তার ইদ্দতও শেষ হয়ে যাবে।

২। অন্যের ইদ্দত পালনকারিণী, অর্থাৎ, যখন কোন নারী অন্য স্বামীর ইদ্দত পালন করবে, তখন তার ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে বিবাহ করা বৈধ হবে না। অনুরূপ ইদ্দত পালন করাকালীন তাকে বিয়ের পায়-

গাম দেওয়াও বৈধ হবে না।

৩। হজ্জ অথবা উমরার নিয়তকারিণী, যতক্ষণ না সে হজ্জ অথবা উমরাহ সুসম্পন্ন করে হালাল হবে, ততক্ষণ তার সাথে বিবাহ করা বৈধ হবে না।

তালাক

প্রকৃত পক্ষে তালাক একটি অপছন্দনীয় বস্তু। কিন্তু যেহেতু কখনো কখনো স্বামীর সাথে স্ত্রীর অবস্থান, অথবা স্ত্রীর সাথে স্বামীর অবস্থান খুবই পীড়াদায়ক হয়ে যাওয়ার কারণে, বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে তালাক দেওয়া অতি প্রয়োজন হয়ে পরে, তাই আল্লাহ রহমতপরবশ তা বান্দাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন।। যখন স্বামী তার স্ত্রীকে অপছন্দ করবে এবং সে অসহ্যকর পরিস্থিতিতে পৌঁছে যাবে, ধৈর্যের কোন উপায় থাকবে না, তখন সে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে। তবে তালাক দেওয়ার সময় তাকে নিম্নে বর্ণিত বিধানের খেয়াল রাখতে হবে।

১। ঋতু অবস্থায় তাকে তালাক দেবে না। যদি ঋতু অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে সে একজন হারাম কাজ সম্পাদনকারী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফারমান বিবেচিত হবে। আর এমতাবস্থায় তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তালাক না দেওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে। অতঃপর পবিত্র হয়ে গেলে, সে ইচ্ছা করলে তাকে তালাক দিতে পারবে। তবে উত্তম হলো, দ্বিতীয় হায়েয পর্যন্ত তালাক না দেওয়া। দ্বিতীয় হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে গেলে, ইচ্ছা করলে তাকে তালাক দিতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে রাখতেও পারে।

২। এমন তুহুরে (পবিত্রাবস্থায়) তালাক দিবে না, যে তুহুরে সে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে, যতক্ষণ না তার গর্ভ প্রকাশ হয়ে যায়। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে মাসিকের পর সহবাস করে থাকে, তাহলে পুনরায় মাসিক হয়ে তা থেকে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাকে তালাক দিতে পারবে না, যদিও এ সময় সুদীর্ঘ হয়। অতঃপর ইচ্ছা করলে তাকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিতে পারবে। তবে যদি তার অন্তঃসত্ত্বা প্রকাশ হয়ে যায়, অথবা সে যদি অন্তঃসত্ত্বা থেকে থাকে, তাহলে তালাক দেওয়াতে কোন দোষ নেই।

তালাকের পর যা আরোপিত হয়

যেহেতু তালাকের অর্থই হলো, স্ত্রীর স্বামীর নিকট থেকে বিচ্ছেদ হওয়া। তাই এই বিচ্ছেদের উপর কিছু বিধান আরোপিত হয়। যেমন,

১। যদি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে থাকে, অথবা স্বামী স্ত্রীর সাথে নির্জনে থেকে থাকে, তাহলে ইদ্দত পালন করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হবে। তবে যদি স্বামী যৌনবাসনায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই তাকে তালাক দিয়ে দেয় এবং তার সাথে নির্জনে না থেকে থাকে, তাহলে তাকে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। আর ইদ্দত হলো, তিন ঋতু, যদি ঋতুমতী হয়। আর যদি ঋতুমতী না হয়, তাহলে তিন মাস। আর গর্ভবতী হলে, গর্ভপাত পর্যন্ত। আর এই ইদ্দতের উদ্দশ্য হলো, স্বামীকে তার স্ত্রীকে প্রত্যাহার করার সুযোগ দেওয়া। অনুরূপ মহিলা গর্ভবতী কি না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া।

২। স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে যদি এই তালাকের পূর্বে দুইবার তালাক দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেওয়া পর রুজু' করে থাকে, অথবা ইদ্দত শেষ হওয়ার পর বিবাহ করে দ্বিতীয় তালাক দিয়ে ইদ্দতের মধ্যেই আবার রুজু' করে থাকে, অথবা ইদ্দতের পর বিবাহ করে থাকে, তারপর আবার তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে যতক্ষণ না স্ত্রী অন্য কারো সাথে সঠিক পন্থায় বিবাহ করবে এবং তাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হবে, ততক্ষণ তার জন্য এই স্ত্রী হালাল হবে না। অতঃপর যদি সে (দ্বিতীয় স্বামী) তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে সে প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে। নারীদের প্রতি রহম

করতঃ এবং স্বামীদের অত্যাচার থেকে তাদেরকে নিষ্কৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক তিন তালাকদাতার উপর তার স্ত্রীকে হারাম করে দিয়েছেন।

খুলআ'

খুলআ' হলো, মালের বিনিময়ে সেই স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রীর তালাক চাওয়া, যাকে সে ঘৃণা করে। তবে স্বামীই যদি স্ত্রীকে ঘৃণা করতঃ তার থেকে তাকে দূর করতে চায়, তাহলে স্ত্রীর নিকট থেকে কোন কিছু নেওয়া তার জন্য বৈধ হবে না। বরং তার কর্তব্য হবে, হয় সে ধৈর্য ধরবে, না হয় তালাক দিবে। আর স্ত্রীর উচিত স্বামীর সাথে তার থাকা একান্তই পীড়াদায়ক ও অসহ্যকর না হলে, খুলআ' না চাওয়া। অনুরূপ ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীকে খুলআ' চাওয়াতে বাধ্য করার জন্য কষ্ট দেওয়া স্বামীর জন্য বৈধ নয়। আর মহরের অধিক স্ত্রীর কাছ থেকে না নেওয়াই মুস্তাহাব।

বিবাহে একে অপরের অধিকার

কোন কারণবশতঃ বিবাহ বন্ধনকে প্রতিষ্ঠিত রাখার, অথবা তা বানচাল করার অধিকার স্বামী-স্ত্রীর রয়েছে। যেমন, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে, অথবা স্ত্রী স্বামীর মধ্যে এমন রোগ বা জন্মগত দোষ পেলো, যা উভয়কে আক্দের সময় জ্ঞাত করানো হয়নি। এমতাবস্থায় তাদের উভয়ের এ বিবাহ বন্ধনকে প্রতিষ্ঠিত রাখা ও না রাখার অধিকার রয়েছে। যেমন মনে করুন,

১। তাদের উভয়ের মধ্যে কেউ পাগল, অথবা এমন রোগাক্রান্ত, যা অপরকে বিবাহের সম্পূর্ণ অধিকার পূরণে অন্তরায় সৃষ্টি করে, এমতাবস্থায় অপরজনের এ বিবাহকে বানচাল করার অধিকার থাকে। যদি এটা সঙ্গমের পূর্বে হয়, তাহলে স্ত্রীর উচিত স্বামীর দেওয়া মহর ফিরত দেওয়া। আর যদি সঙ্গমের পর হয়, তাহলে সে কিছুই ফেরত দেবে না। কেউ কেউ বলেছে, যদি দোষ সম্পর্কে জানা সত্ত্বে না জানিয়ে ধুকা দিয়ে থাকে, তাহলে ফেরত দিতে হবে।

২। যদি সাথে সাথে মহর দিতে অক্ষম হয়, তাহলে স্ত্রী যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে বিবাহকে বানচাল করতে পারে। কিন্তু সহবাসের পর হলে, তা পারবে না।

৩। ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হওয়া। যদি স্বামী ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হয়, তাহলে স্ত্রী সাধ্যানুসারে কিছু দিন অপেক্ষা করার পর কাজীর মাধ্যমে এ বিবাহ বানচাল করতে পারবে।

৪। যদি স্বামী অদৃশ্য হয়ে যায়, সে কোথায় আছে তা যদি কাউকে না জানায়, স্ত্রীর খরচের জন্য যদি কিছু রেখে না যায়, বা কাউকে এ ব্যাপারে অসিয়ত না করে যায়, কেউ যদি তার ব্যয়ভার গ্রহণ না করে এবং তার নিকট ব্যয় করার মত যদি কিছু না থাকে, তাহলে সে শরীয়তের কাজীর মাধ্যমে এ বিবাহ বানচাল করতে পারবে।

অমুসলিমকে বিবাহ করা

ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান ব্যতীত অন্য কোন অমুসলিম নারীকে বিবাহ করা মুসলমানদের জন্য হারাম। আর ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান সহ কোন অমুসলিমকে বিবাহ করা মুসলিম নারীর জন্য বৈধ নয়। অনুরূপ যদি কোন নারী স্বামীর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে যতক্ষণ না স্বামী ইসলাম গ্রহণ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীর জন্য জায়েয হবে না যে, সে নিজেকে স্বামীর জন্য পেশ করবে। নিম্নে অমুসলিমদের সাথে বিবাহ করার কতিপয় বিধান পেশ করা হলো,

১। যদি কাফের স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তারা কোন শরীয়তী নিষেধ ব্যতীত তাদের বিবাহে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। শরীয়তী নিষেধ বলতে যেমন, নারী যদি স্বামীর জন্য হারাম হয়, অথবা তার

করতঃ এবং স্বামীদের অত্যাচার থেকে তাদেরকে নিষ্কৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক তিন তালাকদাতার উপর তার স্ত্রীকে হারাম করে দিয়েছেন।

খুলআ'

খুলআ' হলো, মালের বিনিময়ে সেই স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রীর তালাক চাওয়া, যাকে সে ঘৃণা করে। তবে স্বামীই যদি স্ত্রীকে ঘৃণা করতঃ তার থেকে তাকে দূর করতে চায়, তাহলে স্ত্রীর নিকট থেকে কোন কিছু নেওয়া তার জন্য বৈধ হবে না। বরং তার কর্তব্য হবে, হয় সে ধৈর্য ধরবে, না হয় তালাক দিবে। আর স্ত্রীর উচিত স্বামীর সাথে তার থাকা একান্তই পীড়াদায়ক ও অসহ্যকর না হলে, খুলআ' না চাওয়া। অনুরূপ ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীকে খুলআ' চাওয়াতে বাধ্য করার জন্য কষ্ট দেওয়া স্বামীর জন্য বৈধ নয়। আর মহরের অধিক স্ত্রীর কাছ থেকে না নেওয়াই মুস্তাহাব।

বিবাহে একে অপরের অধিকার

কোন কারণবশতঃ বিবাহ বন্ধনকে প্রতিষ্ঠিত রাখার, অথবা তা বানচাল করার অধিকার স্বামী-স্ত্রীর রয়েছে। যেমন, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে, অথবা স্ত্রী স্বামীর মধ্যে এমন রোগ বা জন্মগত দোষ পেলো, যা উভয়কে আকদের সময় জ্ঞাত করানো হয়নি। এমতাবস্থায় তাদের উভয়ের এ বিবাহ বন্ধনকে প্রতিষ্ঠিত রাখা ও না রাখার অধিকার রয়েছে। যেমন মনে করুন,

১। তাদের উভয়ের মধ্যে কেউ পাগল, অথবা এমন রোগাক্রান্ত, যা অপরকে বিবাহের সম্পূর্ণ অধিকার পূরণে অন্তরায় সৃষ্টি করে, এমতাবস্থায় অপরজনের এ বিবাহকে বানচাল করার অধিকার থাকে। যদি এটা সঙ্গমের পূর্বে হয়, তাহলে স্ত্রীর উচিত স্বামীর দেওয়া মহর ফিরত দেওয়া। আর যদি সঙ্গমের পর হয়, তাহলে সে কিছুই ফেরত দেবে না। কেউ কেউ বলেছে, যদি দোষ সম্পর্কে জানা সত্ত্বে না জানিয়ে ধুকা দিয়ে থাকে, তাহলে ফেরত দিতে হবে।

২। যদি সাথে সাথে মহর দিতে অক্ষম হয়, তাহলে স্ত্রী যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে বিবাহকে বানচাল করতে পারে। কিন্তু সহবাসের পর হলে, তা পারবে না।

৩। ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হওয়া। যদি স্বামী ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হয়, তাহলে স্ত্রী সাধ্যানুসারে কিছু দিন অপেক্ষা করার পর কাজীর মাধ্যমে এ বিবাহ বানচাল করতে পারবে।

৪। যদি স্বামী অদৃশ্য হয়ে যায়, সে কোথায় আছে তা যদি কাউকে না জানায়, স্ত্রীর খরচের জন্য যদি কিছু রেখে না যায়, বা কাউকে এ ব্যাপারে অসিয়ত না করে যায়, কেউ যদি তার ব্যয়ভার গ্রহণ না করে এবং তার নিকট ব্যয় করার মত যদি কিছু না থাকে, তাহলে সে শরীয়তের কাজীর মাধ্যমে এ বিবাহ বানচাল করতে পারবে।

অমুসলিমকে বিবাহ করা

ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান ব্যতীত অন্য কোন অমুসলিম নারীকে বিবাহ করা মুসলমানদের জন্য হারাম। আর ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান সহ কোন অমুসলিমকে বিবাহ করা মুসলিম নারীর জন্য বৈধ নয়। অনুরূপ যদি কোন নারী স্বামীর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে যতক্ষণ না স্বামী ইসলাম গ্রহণ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীর জন্য জায়েয হবে না যে, সে নিজেকে স্বামীর জন্য পেশ করবে। নিম্নে অমুসলিমদের সাথে বিবাহ করার কতিপয় বিধান পেশ করা হলো,

১। যদি কাফের স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তারা কোন শরীয়তী নিষেধ ব্যতীত তাদের বিবাহে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। শরীয়তী নিষেধ বলতে যেমন, নারী যদি স্বামীর জন্য হারাম হয়, অথবা তার

সাথে বিবাহ করা যদি হালাল না হয়, তাহলে তাদের উভয়কে একে অপর থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে।
২। যদি কোন ইয়াহুদী বা খ্রীষ্টান নারীর স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তারা তাদের বিবাহে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।
৩। ইয়াহুদী বা খ্রীষ্টান ব্যতীত স্বামী-স্ত্রীর কেউ যদি সঙ্গমের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে নিকাহ বাতিল গণ্য হবে।
৪। যদি ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান, বা অন্য কোন অমুসলিম স্বামীর স্ত্রী সহবাসের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে, কেননা, কোন মুসলিম নারী কাফেরের জন্য বৈধ নয়।
৫। যদি কোন কাফেরের স্ত্রী সঙ্গমের পর ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিষয় স্থগিত থাকবে। অতঃপর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে এবং স্বামী ইসলাম কবুল না করলে, তা বাতিল গণ্য হবে। এরপর স্ত্রী চাইলে বিবাহ করতেও পারে, আবার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতেও পারে। আর এই সময়ের মধ্যে স্ত্রীর স্বামীর উপর কোন অধিকার থাকবে না। অনুরূপ স্ত্রীর উপর স্বামীর কোন আধিপত্যও থাকবে না। যদি স্বামী ইসলাম কবুল করে নেয়, তাহলে আগের স্ত্রী স্ত্রীই থাকবে নতুনভাবে বিবাহ করার প্রয়োজন হবে না, যদিও অপেক্ষার সময় সুদীর্ঘ হয়ে যায়। ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান ব্যতীত অন্য অমুসলিম নারীর স্বামী ইসলাম কবুল করলে, তার বিধানও অনুরূপ।
৬। যদি যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই স্ত্রী মুর্তাদ (ধর্ম বিমুখ) হয়ে যায়, তাহলে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং সে মহরও পাবে না। তবে যদি স্বামীই মুর্তাদ হয়ে যায়, তাহলে বিবাহ বানচাল হয়ে যাওয়া সহ অর্ধেক মহরও দিতে হবে। তাদের মধ্যে যে মুর্তাদ হয়েছিল, সে যদি পুনরায় ইসলাম স্বীকার করে নেয়, তাহলে তারা প্রথম বিবাহের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যদি তাদের মধ্যে কোন তালাক সংঘটিত না হয়ে থাকে।

ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান নারীদেরকে বিবাহ করার ক্ষতি

আল্লাহ তা'য়ালার বিবাহ ব্যবস্থাকে বৈধ করার মধ্যে উদ্দেশ্য হলো, চরিত্রের পরিশুদ্ধি করণ, সমাজকে কুসংস্কার থেকে পবিত্র করণ, সন্তানাদির সংরক্ষণ এবং সমাজের জন্য একটি সুষ্ঠ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সংস্থাপন সহ এমন মুসলিম উম্মার গঠন, যার মুখ থেকে উচ্চারিত হবে-لا إله إلا الله محمد رسول الله 'আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর প্রেরিত রাসূল'। সুতরাং কোন নেক, ধার্মিকা, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্না ও চরিত্রবান মহিলাকে বিবাহ করা ব্যতীত উক্ত উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের মেয়েকে বিয়ে করার কতিপয় কুপ্রভাবের কথা নিম্নে উল্লেখ করা হলো,

১। **পরিবারে তার প্রভাব।** ছোট পরিবারে স্বামী যদি ব্যক্তিগতভাবে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়, তাহলে তার প্রভাবে স্ত্রীর প্রভাবিতা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ও বড় আশা থাকে যে, সে ইসলাম কবুলে ধন্য হয়ে যাবে। আবার এর বিপরীতও হতে পারে। কারণ কখনো স্ত্রী অন্য ধর্মকে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং ঐ সমস্ত জিনিস সে পালন করে, যে ব্যাপারে সে মনে করে যে, তার ধর্ম এগুলিকে বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছে। যেমন, শারাব পান করা, শূকরের মাংস ভক্ষণ করা এবং গোপনে প্রেম করা ইত্যাদি। আর এইভাবে একটি মুসলিম পরিবার ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ে। সে পরিবারের ছেলেরা কুসংস্কারের ভিত্তিতে গড়ে উঠে। আবার কখনো সমস্যা আরো জঘন্য পরিস্থিতির স্বীকার হয়, যখন এই অজ্ঞভক্তা বা নাফরমান স্ত্রী আপন সন্তানদেরকে সাথে করে গীর্জায় নিয়ে গিয়ে খ্রীষ্টানদের নামায দেখায় এবং তাদের মধ্যে এর বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। কথায় বলে, যে ব্যক্তি যে জিনিসের উপর লালিত-পালিত হয়, সে সেই জিনিসের স্বভাবে স্বভাবিত হয়।

২। **সমাজে তার প্রভাব।** মুসলিম সমাজে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান নারীদের আধিক্য খুবই ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক ব্যাপার। সমাজে এর ক্ষতি হলো, মুসলিম উম্মার অবনতি ও খ্রীষ্টানদের অর্থনৈতিক উন্নতির সময়,-যা বর্তমানে বিদ্যমান- এই নারীরা মুসলিম উম্মার চিন্তাধারার উপর বিপজ্জনক আক্রমণ চালাতে ও পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে এবং খ্রীষ্টীয় কার্য-কলাপ ও জঘন্য স্বভাব প্রচারের জন্য দূতের কাজ করে। তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্যহলো, নারী-পুরুষের উলঙ্গাবস্থায় মেলামেশার স্বভাব সহ অন্য আরো ইসলামী শিক্ষা বিরোধী প্রচেষ্টা।

أحكام المرأة المسلمة

মুসলিম নারীর বিধান

ইসলামে নারীর মর্যাদা

ইসলামে নারিদের অধিকার সম্পর্কে উপস্থাপনের পূর্বে অন্যান্য জাতির নিকট তাদের মর্যাদা এবং তাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করা হতো, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা অতি আবশ্যক মনে করছি।

ইউনানদের নিকট মেয়েরা ছিল বেচা-কেনার সামগ্রী। তাদের কোন প্রকার অধিকার ছিল না। সমস্ত অধিকার পুরুষদের জন্যই বরাদ্দ ছিল। মিরাস থেকে তারা ছিল বঞ্চিতা। ধন-সম্পদে তাদেরকে কোন হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হত না। প্রসিদ্ধ দার্শনিক সুক্বরাতেরের বক্তব্য হলো, "পৃথিবীর অধঃপতনের বড় ও প্রধান কারণই হলো নারীদের অস্তিত্ব। নারীরা হলো এমন একটি বিষাক্ত বৃক্ষের মত, যার বাহ্যিক অতি সুন্দর কিন্তু চড়ুই পাখি যখনই সেই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু বরণ করে"।

রোমরা নারীদেরকে একটি আত্মাহীন বস্তু বলে গণ্য করতো। নারীদের কোন অধিকার এবং কোন মূল্য তাদের নিকট ছিল না। তাদের কথা হলো, "নারীদের রুহ বা আত্মা নেই"। তাই তাদেরকে খুঁটির সাথে বেঁধে শরীরে গরম ও ফুটন্ত তেল ঢেলে মর্মান্তিক শাস্তি দেওয়া হতো। কখনো কখনো এই নিষ্পাপ নারীদেরকে দ্রুতগামী ঘোড়ার লেজের সাথে বেঁধে দ্রুতগতিতে ছুটিয়ে তাদের প্রাণ নাশ করা হতো।

হিন্দু ধর্মে নারীর অবস্থা আরো জঘন্য ও নিকৃষ্ট ছিল। তারা নারীকে তার স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিত।(যাকে সতীদাহ প্রথা বলা হয়)

চীনারা বলে, নারীরা এমন যাতনাদায়ক পানি সদৃশ, যা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধিকে ধুয়ে-মুছে বিনাশ করে দেয়। প্রত্যেক চীনার তার স্ত্রীকে বিক্রয় করার এবং জীবদ্দশায় তাকে সমাধিস্থ করার অধিকার ছিল।

ইয়াহুদীরা নারীদের মনে করে এক অভিশপ্ত প্রাণী। কারণ, এই নারীই নাকি আদমকে পথভ্রষ্ট করেছে এবং তাঁকে (নিষিদ্ধ) বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে বাধ্য করেছে। অনুরূপ তারা নারীকে অপবিত্রা মনে করে। তাই যখন তার মাসিক হয়, তখন সমস্ত ঘর ও তার স্পর্শীয় সমস্ত বস্তু অপবিত্র হয়ে যায়। অনুরূপ ভায়ের উপস্থিতিতে পিতার সম্পদ থেকে সে মিরাসও পেত না।

খ্রীষ্টানদের নিকট নারী হলো, শয়তান। খ্রীষ্টান ধর্মের একজন পুরোহিতের কথা হলো, মানব জাতির সাথে নারীর কোন সম্পর্ক নেই। সাধু বুনাফান্তুর বলে, "যখন কোন নারীকে দেখবে, তখন এটা মনে করবে না যে, তোমরা কোন মানব মূর্তি দেখেছ, এমনকি কোন চতুষ্পদ পশুও না, বরং যা দেখেছ, তা নিছক শয়তান। আর তা হতে যা শুন, তা হলো, আজদাহার বাঁশি"। ব্রিটিশ আইনানুসারে বিগত শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত নারীরা দেশের নাগরিক হিসাবে গণ্য হত না। অনুরূপ ব্যক্তিগত কোন অধিকার তাদের থাকতো না। সব রকমের মালিকত্ব থেকে তারা হত বঞ্চিতা। এমনকি পরিহিত পোশাকটারও তারা মালিক হত না। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যান্ড পার্লামেন্টে এ আইন প্রণয়ন হয় যে, নারীদেরকে কোন কিছুর উপর আধিপত্য দেওয়া বৈধ নয়। অনুরূপ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সপ্তম হেনরীর যুগে নারীদের জন্য ইঞ্জীল পাঠ নিষিদ্ধ করে দেয়। কারণ, তারা অপবিত্রা। নারীরা মানুষ কিনা এ ব্যাপারে পর্যবেক্ষণের জন্য ৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে এটাই স্বীকৃতি পায় যে, নারীরা মানুষ, তবে তাদেরকে পুরুষের সেবার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। ব্রিটিশ আইনানুযায়ী ১৮০৫ খ্রীঃ পর্যন্ত স্বামীর জন্য তার স্ত্রীকে বিক্রয় করা বৈধ ছিল। ছয় পেনী (ব্রিটিশ মুদ্রা) পর্যন্ত তার মূল্য নির্দিষ্ট ছিল।

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরবে নারীরা খুবই তুচ্ছ, তাজ্য ও হেয় প্রতিপন্না ছিল। না তারা মিরাস পেত

না কোন অধিকার। এমনকি তাদেরকে কোন কিছু গণ্যই করা হত না। আবার অনেকে তাদের মেয়েদেরকে জীবন্ত সমাধিস্থ করতো। অতঃপর নারীদেরকে নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি দিতে এবং নারী-পুরুষ সকলে সমান, পুরুষের ন্যায় তাদেরও অধিকার আছে-এর উদাত্ত ঘোষণা দিতে আবির্ভাব হয় ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ الحجرات١٣

অর্থাৎ, "হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী হতে সৃষ্টি করেছি। তার পর তোমাদেরকে জাতি ও ভাতৃগোষ্ঠী বানিয়ে দিয়েছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। বস্তুতঃ আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবাধিক সম্মানী সে, যে তোমাদের মধ্যে সব চেয়ে খোদাভীরু"। (৪৯ঃ ১৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ النساء١٢٤

অর্থাৎ, "আর যে নেক কাজ করবে-সে পুরুষ হোক বা মহিলা হোক- সে যদি ঈমানদার হয়, তবে এই ধরনের লোকই বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং তাদের বিন্দু পরিমাণ হক্বও নষ্ট হতে পারবে না"। (৪ঃ ১২৪) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾

অর্থাৎ, "আমরা মানুষকে নিজের পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি"। (২৯ঃ ৮) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

﴿ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ ﴾

অর্থাৎ, "সম্পূর্ণ ঈমানদার তো সে-ই, যার চরিত্র সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীদের জন্য উত্তম"।(তিরমিজী) এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করে বলল,

﴿ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبُوكَ ﴾

অর্থাৎ, "মানুষের মধ্যে আমার উত্তম ব্যবহারের সর্বাধিক অধিকারী কে? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার মা। অতঃপর সে বলল, তার পর কে? বললেন, তোমার মা। অতঃপর বলল, তার পর কে? বললেন, তোমার মা। তার পর কে? বললেন, তোমার বাপ"।(বুখারী-মুসলিম) এই হলো নারীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে ইসলামের ধ্যান-ধারনা।

নারীর সাধারন অধিকার

নারীর এমন সাধারণ অধিকার রয়েছে, যা তার নিজেরও জানা উচিত এবং সকলের এই মৌলিক অধিকার গুলোর স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। ফলে যখনই চাইবে তা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারবে। আর এই অধিকারের সার কথা হলো,

১। মালিক হওয়ার অধিকার। নারী ঘর-বাড়ী, চাষাবাদ, জমি, শিল্পকারখানা, উদ্যান, সোনা-রূপা ও বিভিন্ন প্রকারের গবাদি পশু সহ সব কিছুর মালিক হতে পারবে। চায় সে- স্ত্রী হোক, বা মা হোক, অথবা কন্যা বা বোন

হোক।

২। বিয়ে করা, স্বামী নির্বাচন, খুলআ' কামনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার তার রয়েছে। আর এগুলি নারীর প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত অধিকার।

৩। তার উপর ওয়াজিব তথা অত্যাবশ্যক বস্তুর শিক্ষা গ্রহণের অধিকার ও অনস্বীকার্য বিষয়। যেমন, মহান আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন, তাঁর এবাদত করার পদ্ধতি শিক্ষা, নৈতিক দায়িত্ব ও করনীয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা, তার সামগ্রিক জীবনের শিষ্টাচার সম্পর্কে জানা এবং উৎকৃষ্ট চরিত্রের জ্ঞান অর্জন করা প্রভৃতি। কারন এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ সকলের জনাই। তিনি বলেন,

﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ محمد١٩

অর্থাৎ, "জেনে রাখো! আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই"। (৪৭: ১৯) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

﴿ طلب العلم فريضة على كل مسلم ﴾ ابن ماجة

অর্থাৎ, "প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয"। (ইবনে মাজা)

৪। নিজের ধন-সম্পদ ও অর্থবিত্ত থেকে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী সাদকা করতে ও স্বামী, সন্তান-সন্ততি এবং পিতা-মাতার জন্য ব্যয় করতে পারবে, যতক্ষণ না সেটা অপচয় ও অপব্যয়ের পর্যায় পৌঁছে। এ ব্যাপারে তার অধিকার সম্পূর্ণরূপে পুরুষের অধিকারের মত।

৫। ভালবাসা ও ঘৃণা করার অধিকার। সে সৎ ও নির্মলচরিত্রা নারীগণকে ভালবাসতে পারবে। ফলে স্বামী থাকলে তার অনুমতিক্রমে তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ, তাদেরকে উপহার দেওয়া, পত্র বিনিময় করা, কুশলাদি জিজ্ঞেস করা, বিপদ ও দুর্যোগের দিনে সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করবে। (এটা নারীর শুধু অধিকার নয়, বরং এটা তার উচ্চ মানসিকতা ও দায়িত্ব সচেতনতার পরিচয়) অধিকন্তু চরিত্রহীনা মহিলাদের ঘৃণা করবে এবং আল্লাহর নিমিত্তে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে।

৬। জীবদ্দশায় নিজ ধন-সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের অসীয়ত করতে পারবে এবং কোন অভিযোগ আপত্তি ছাড়া তার মৃত্যুর পর তা কার্যকর হবে। কেননা, অসীয়ত সাধারণ ব্যক্তিগত অধিকার। এ অধিকার যেমনি পুরুষের রয়েছে তেমনি নারীরও আছে। কারণ আল্লাহর সাওয়াব ও প্রতিদান থেকে কেউ অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। তবে অসীয়ত কৃত অর্থ ও ধন-সম্পদ এক তৃতীয়াংশের বেশী হতে পারবে না। আর এতেও পুরুষ ও নারীর অধিকার সমান।

৭। স্বর্ণ ও রেশম যা চায় পরিধান করতেপারবে। আর এদুটি পুরুষদের জন্য হারাম। কিন্তু পরিধানের অধিকার ও স্বাধীনতার অর্থ কখনো এ নয় যে, পোশাক শূন্য হয়ে যাবে, অথবা অর্ধাংশ, এক চতুর্থাংশ কাপড় পরবে কিংবা মাথা, গলা ও বক্ষোদেশ উম্মুক্ত রাখবে। হ্যাঁ, যদি এমন কোন ব্যক্তি হয় যার সামনে এগুলি করা যেতে পারে তার ব্যাপার ভিন্ন।

৮। রূপচর্চার অধিকার, অর্থাৎ, আপন স্বামীর মন সন্তুষ্টির জন্য রূপচর্চা করতে পারবে। সুরমা লাগাতে পারবে। গালে ও ওষ্ঠে লাল লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারবে, যদি সে ইচ্ছা করে। সর্বোৎকৃষ্ট মনোহারী ও সুন্দর পোশাক এবং হার ও গহনা পরতে পারবে। বাতিল ও সন্দেহ-সংশয়ের স্থান থেকে দূরে থাকার সংকল্পে পোশাক পরিচ্ছদে অমুসলিম নারীদের অথবা বেশ্যা, পতিতা ও দেহ ব্যবসায়ী লম্পট নারীদের ফ্যাশন অবলম্বন করবে না।

৯। পানাহারের অধিকার। যা-ই স্বাদ লাগে ও পছন্দ হয়, তা-ই সে পানাহার করতে পারবে। পানাহারের ব্যাপা-

যে নারী-পুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই। যেমনি হালাল বস্তু উভয়ের জন্য হালাল, তেমনি হারাম বস্তু উভয়ের জন্য হারাম। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ الأعراف٣١

অর্থাৎ, "খাও, পান কর এবং অপচয় কর না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীকে ভালবাসেন না"। (৭:৩১) এ সম্বোধনে উভয় জাতিই অন্তর্ভুক্ত।

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

স্বামীর উপর স্ত্রীর বিশেষ অধিকার রয়েছে। এ সমস্ত অধিকার স্ত্রীর স্বামীর কিছু অধিকার পালন করার জন্য ওয়াজিব হয়। আর তা হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা না হলে, স্বামীর আনুগত্য করা, তার খাবার তৈরী করা, বিছানা পরিপাটি রাখা, তার সন্তানদের দুধ পান করানো, তাদের লালন-পালন করা, তার অর্থ ও মান মর্যাদা রক্ষা করা, নিজের সম্ভ্রম ও সতীত্ব রক্ষা করা, তার জন্য বৈধতার আওতায় রূপচর্চা করা ও নিজেকে সৌন্দর্যময় রাখা। নিম্নোক্ত জিনিসগুলি স্বামীর উপর স্ত্রীর অত্যাবশ্যকীয় অধিকার, যা আল্লাহর বাণী প্রমান করে,

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ البقرة٢٢٨

অর্থাৎ, "নারীদের জন্য সঠিকভাবে সে রূপ অধিকার নির্দিষ্ট রয়েছে যেমন তাদের উপর পুরুষদের অধিকার রয়েছে"। (২: ২২৮) আমরা সে অধিকারগুলো তুলে ধরছি, যেন মু'মিন নারী তা জেনে নেয় এবং লজ্জা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ভয় ভীতি ছাড়াই তা দাবী করে। আর স্বামীর দায়িত্ব হলো, সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খারূপে আদায় করা। হ্যাঁ, স্ত্রী তার অধিকারের কোন কিছু স্বামীকে ক্ষমা করতে চাইলে, তা সে করতে পারে।

১। স্বামী স্বীয় আর্থিক সচ্ছল বা সংকটজনক অবস্থা অনুসারে স্ত্রীর সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করবে। স্ত্রীর পোশাক, পানাহার, চিকিৎসা ও বাসস্থান এ ব্যয়ভারের আওতায় পরে।

২। স্বামী, স্ত্রীর অভিভাবক হেতু তার মান-সম্ভ্রম, দেহ, অর্থ-সম্পদ ও দ্বীন রক্ষা স্বামীর দায়িত্ব। কেননা, কোন কিছুর অভিভাবক হওয়ার মানেই হলো তার দেখা-শুনা, পরিচর্যা ও হেফাজত করা।

৩। দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে, দ্বীনের জরুরী বিষয় শিক্ষা দেওয়া। তবে স্বামী তাতে সক্ষম না হলে, অন্ততপক্ষে মহিলাদের জন্য আয়োজিত ইলমের সমাবেশগুলোতে যোগদান করার অনুমতি দেবে। তা মসজিদ, মাদ্রাসায়, হোক বা অন্য কোথাও। তবে শর্ত এই যে, সেখানে ফেতনা বা স্বামী-স্ত্রীর ক্ষতি সাধিত না হওয়ার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত থাকতে হবে।

৪। স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করা তার অন্যতম অধিকার। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ النساء١٩

অর্থাৎ, "তাদের (স্ত্রীলোকদের) সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর"। (৪: ১৯) স্ত্রীর যৌন কামনা পূরণের অধিকার হরণ না করা, গালি ও মন্দ ব্যবহার না করা। ফিতনার ভয় না থাকলে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ করতে বাধা না দেওয়া, শক্তি ও সামর্থ্যের উর্দ্ধে কাজের চাপ না দেওয়া এবং কথা ও আচরণে সুন্দর ব্যবহার করা সদ্ভাবে জীবন-যাপন করার আওতাভুক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

((خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي))

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে নিজ স্ত্রীর কাছে সর্বোত্তম। আর আমি আমার পরিবারের

নিকট তোমাদের চেয়ে উত্তম"। (তিরমিযী) তিনি আরো বলেন,

((ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم))

অর্থাৎ, মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই নারীদের মর্যাদা দান করেন। আর অভদ্র অসভ্যরাই তাদের তুচ্ছ ভাবে"।

পর্দা

পরিবারকে ধ্বংস ও অবনতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ইসলাম সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিয়েছে, এবং তাকে চরিত্র ও শিষ্টাচারের শক্ত জালের মাধ্যমে সুরক্ষিত করেছে। যাতে পরিবার ও সমাজ এমন সুষ্ঠ ও সুন্দর হয়, যেখানে থাকবে না প্রবৃত্তির উপদ্রব এবং স্বেচ্ছাচারের দৌরাত্ম্য। ফিতনা সৃষ্টিকারী সকল উত্তেজনামূলক পথকে অবরোধ করতে নারী-পুরুষকে দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ তা'য়ালা নারীর সম্মানার্থে, তার মান সম্ভ্রমকে লাঞ্ছনা ও অপমাননার হাত থেকে রক্ষার্থে কুপ্রবৃত্তি ও অসৎলোকের কুদৃষ্টি থেকে তাকে দূরে রাখতে, যাদের নিকট মান-মর্যাদার কোন মূল্য নেই, তাদের থেকে তাকে হেফাজত করতে, বিষাক্ত দৃষ্টির সৃষ্ট ফিতনার দরজা বন্ধ করতে এবং তার সম্ভ্রম ও নৈতিক পবিত্রতাকে সম্মান ও শ্রদ্ধার জালে সুরক্ষিত রাখতে পর্দার বিধান দানকরেন।

আলেমদের ঐকমত্যানুযায়ী হাত ও মুখমণ্ডল ব্যতীত সর্বাঙ্গ আবৃত রাখা ওয়াজিব। নারীর কর্তব্য হলো, অপরিচিত পর পুরুষের সামনে সৌন্দর্যের প্রকাশ না করা। আর হাত ও মুখমণ্ডলকে আবৃত রাখার ব্যাপারে আলেমরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন।প্রত্যেক দলের নিকট তাদের মতের সমর্থনে প্রমাণাদিও রয়েছে। আর পর্দা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দলীলাদির সংখ্যা অনেক। প্রত্যেক দল পর্দা সম্পর্কে বর্ণিত প্রমাণাদির কিছু অংশকে স্বীয় মতের সমর্থনে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং তার পরিপন্থী দলীলসমূহকে বিভিন্ন উক্তির দ্বারা খণ্ডন করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ الأحزاب٥٣

অর্থাৎ, "নবীর স্ত্রীদের নিকট থেকে তোমাদের কিছু চেয়ে নিতে হলে পর্দার বাইরে থেকে চেয়ে পাঠাও। তোমাদের ও তাদের অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এটা উত্তম পন্থা"। (৩৩ঃ ৫৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ الأحزاب٥٩

অর্থাৎ, "হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও ঈমানদার লোকদের মহিলাগণকে বলে দাও, তাঁরা যেন নিজেদের উপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এটা অধিক উত্তম নিয়ম ও রীতি। যেন তাঁদেরকে চিনতে পারা যায় ও তাঁদেরকে উত্যক্ত করা না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান"। (৩৩ঃ ৫৯) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ... ﴾ النور٣٠

অর্থাৎ, "আর হে নবী, মু'মিন স্ত্রীলোকদের বল, তাঁরা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে ও নিজেদের সাজ-সজ্জা না দেখায়, কেবল সেইসব জিনিস ছাড়া যা আপনা আপনিই প্রকাশ হয়ে পড়ে। এবং নিজেদের বক্ষোদেশের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে। আর নিজেদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ করবে না, কিন্তু কেবল এই লোকদের সামনে, তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীদের

পিতা, নিজেদের পুত্র, স্বামীদের পুত্র, নিজেদের ভাই, ভাইদের পুত্র, বোনদের পুত্র, নিজেদের মেলা-মেশার স্ত্রীলোক, নিজের দাসী, সেইসব অধীনস্থ পুরুষ যাদের অন্য কোন রকম গরয নাই, আর সেইসব বালক যারা স্ত্রীলোকদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো ওয়াকিফহাল হয় নাই। আর তারা নিজেদের পা যমীনের উপর সজোরে ফেলে চলা-ফেরা করবে না, এইভাবে যে, নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছে লোকেরা তা জানতে পারে"। (২৪ঃ ৩১) হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

﴿ كَانَ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْفَجْرِ فَكَانَ إِذَا إنصرفن مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ، لَايُعْرَفْهِنَّ أحدٌ مِنَ الْغَلَسِ ﴾ النسائي

অর্থাৎ, "নারীরা নিজেদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ফজরের নামাজে যোগদান করতেন। অতঃপর নামায শেষে চাদরে নিজেদেরকে আবৃত করে আপন আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করাকালীন অন্ধকারের জন্য তাঁদেরকে কেউ চিনতে পারত না"। (নাসায়ী) আয়েশা থেকেই বর্ণিত। তিনি বলেন,

﴿ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا، وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُحْرِمَاتٍ فَإِذَا حَاذُوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحدَاهُنَّ جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ ﴾ أخرجه أبوداود

অর্থাৎ, "আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ইহরাম অবস্থায় থাকাকালীন সাওয়ারীরা যখন আমাদের নিকট হয়ে অতিক্রম করত, তখন আমাদের কেউ তার চাদর মাথা থেকে মুখমন্ডল পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিত। অতঃপর যখন তারা চলে যেত, আমরা মুখমন্ডল খুলে নিতাম"। আয়েশা থেকেই বর্ণিত। তিনি বলেন,

(يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ ... ﴾ شَقَقْنَ مُرُوْطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا) البخاري

অর্থাৎ, (সর্ব প্রথম হিজরতকারীদের স্ত্রীগণের উপর আল্লাহ রহম করুন! যখন আল্লাহর এই বাণী, "এবং নিজেদের বক্ষোদেশের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে" অবতীর্ণ হয়, তখন নিজেদের চাদরকে দু'ভাগ করে একাংশকে ওড়না বানিয়ে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন"।

পর্দার ব্যাপারে বর্ণিত প্রমাণাদির সংখ্যা অনেক। এ ব্যাপারে মতভেদের উল্লেখ না করেও বলা যায় যে, প্রয়োজন বোধে নারী তার মুখমন্ডল খুলতে পারে এ ব্যাপারে সকলের একমত।যেমন ডাক্তারের সামনে চিকিৎসার জন্য খোলা ইত্যাদি। অনুরূপ সকলে মনে করেন যে, ফিতনার আশংকা থাকলে মুখমন্ডল খুলে রাখা বৈধ হবে না। যাঁরা মুখমন্ডলকে খুলে রাখা বৈধ বলে মনে করেন তারাও ফিতনার আশংকাকালীন তা আবৃত রাখা ওয়াজিব বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আর বর্তমানে যখন ফিতনা-ফাসাদ ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে, অসৎ ও ফাসেক প্রকৃতির মানুষ এত আধিক্য লাভ করেছে যে, শহর-বাজার ও সর্বত্র তা ছেয়ে গেছে এবং সৎ ও খোদাভীরু লোকের হার কমে গেছে, এর থেকে ফিতনার আশংকা আর কি হতে পারে?

চরিত্র, পরিবার ও মান-সম্মানকে সুরক্ষিত রাখার জন্যই পরপুরুষের সাথে অবৈধ মেলা-মেশা নারীর উপর ইসলাম হারাম করে দিয়েছে। ইসলাম মানুষের হেফাযত ও ফেতনা-ফাসাদের সমস্ত পথকে বন্ধ করতে খুবই তৎপর। আর নারীর পর্দাহীনভাবে চলা-ফেরায়, অপরিচিত লোকদের সাথে বাধাহীনভাবে মেলা-মেশায় প্রবৃত্তির তাড়না জেগে উঠে, অনাচারের পথ সুগম হয়ে যায় এবং অন্যায় অনৌচিত্য কর্ম-কান্ড অনায়াসে সংঘটিত

হয়ে যায়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ الأحزاب٣٣

অর্থাৎ, "নিজেদের ঘরে অবস্থান কর এবং পূর্বতন জাহেলী যুগের সাজগোজ দেখিয়ে বেড়াইও না"। (৩৩ঃ ৩৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ الأحزاب٣٣

অর্থাৎ, "নবীর স্ত্রীদের নিকট থেকে তোমাদের কিছু চেয়ে নিতে হলে পর্দার বাহিরে থেকে চেয়ে পাঠাও। এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য উত্তম পন্থা"। (৩৩ঃ ৫৩)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী-পুরুষের অবৈধ মেলা-মেশাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এমনকি এ পথে উদ্বুদ্ধকারী সকল উপায় উপকরণকেও অবরোধ করে দিয়েছেন, যদিও তা এবাদতের ক্ষেত্রে ও এবাদতের স্থানেও হয়। কখনো কখনো নারী নিজ বাড়ী থেকে ঐ স্থানে যেতে বাধ্য হয়, যেখানে পুরুষের সমাগম। যেমন, তার নিকট তার প্রয়োজন পূরণ করে দেওয়ার মত কেউ না থাকাকালীন প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য যাওয়া। অথবা তার নিজের জন্য বা তার অধীনস্থদের জন্য জীবিকার কেনা-বেচা সহ অন্যান্য প্রয়োজনাদির জন্য যাওয়া, এমতাবস্থায় তার বাড়ী থেকে বের হওয়াতে কোন দোষ নেই। তবে শরীয়তের বিধি-বিধানকে খেয়াল রেখে চলা-ফেরা করতে হবে। যেমন, ইসলামী বেশভূষায়, সর্বাঙ্গ ঢেকে, সৌন্দর্যের প্রকাশ না করে বের হওয়া এবং পুরুষদের থেকে সব সময় পৃথক থাকা, তাদের সাথে মিশে না যাওয়া। পরিবার ও সমাজকে (অন্যায় ও অনাচার থেকে) রক্ষার জন্য ইসলাম যে সমস্ত বিধান প্রণয়ন করেছে, তম্মধ্যে অপরিচিত কোন ব্যক্তির সাথে নারীর নির্জনে অবস্থান করাকে হারাম বলে ঘোষণা দেওয়া হলো অন্যতম বিধান। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপরিচিত কোন ব্যক্তির সাথে নারীর নির্জনে থাকাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন যদি তার সাথে তার স্বামী বা মাহরাম (যাদের সাথে তার বিয়ে হারাম) না থাকে। কেননা, শয়তান মানুষের আত্মা ও চরিত্রকে কলঙ্কিত করার কাজে দারুণভাবে তৎপর।

মাসিক ও নিফাস (প্রসবোত্তর রক্তপাত)- এর বিধান

মাসিকের সময় সীমা

১। অধিকাংশ যে বয়সে মাসিক আসতে দেখা যায় তা হলো, ১২ থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত। তবে নারীর মাসিক এর আগে অথবা পরেও আসতে পারে তা নির্ভর করে তার অবস্থা ও আবহাওয়ার উপরে।

২। মাসিকের অল্পাধিকের কোন নির্ধারিত দিন নেই।

গর্ভবতীর মাসিক। অধিকাংশ নারীরা যখন গর্ভবতী হয়, তখন তাদের ঋতু বন্ধ হয়ে যায়। তবে যদি গর্ভবতী রক্ত দেখে আর তা যদি প্রসবের দু'দিন অথবা তিন দিন আগে হয় আর তার সাথে প্রসব বেদনাও যদি অনুভব করে, তাহলে সেটা নিফাসের খুন বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি প্রসবের অনেক দিন অথবা অল্প দিন আগে হয়, আর বেদনা যদি না থাকে, তাহলে সেটা না নিফাসের খুন হবে আর না হায়েযের। তবে যদি অনবরত হাজের রক্ত আসতে থাকে গর্ভবতী হওয়ার পরও যদি তা বন্ধ না হয়, তাহলে সেটা মাসিক বলেই গণ্য হবে।

মাসিকের ব্যতিক্রম। মাসিকের ব্যতিক্রম কয়েক প্রকারের হয়। যেমন,

১। কম-বেশী হওয়া। অর্থাৎ, নারীর নির্ধারিত অভ্যাস হলো ছয় দিন কিন্তু মাসিক সাত দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকছে, অথবা তার নিয়ম সাত দিন অথচ সে ছয় দিনেই পবিত্রা হয়ে গেছে।

২। আগে-পরে হওয়া। অর্থাৎ, নারীর নিয়ম হলো মাসের শেষে হায়েয আসা কিন্তু মাসের শুরুতেই হায়েয আসতে দেখলো, অথবা তার নিয়ম মাসের প্রথম দিকেই হায়েয আসা কিন্তু হায়েয মাসের শেষে আরম্ভ হল। সে যখনই রক্ত দেখবে, তখনই সে হায়েযজনিতা বলে পরিগণিতা হবে। আর যখনই তা থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে, তখনই পবিত্রা বলে গণ্য হবে, তাতে তার নিয়মের বেশী হোক, কিংবা কম হোক, আগে হোক কিংবা পরে হোক।

৩। মাসিকের তৃতীয় ব্যতিক্রম হলো, রক্তের রং হলুদবর্ণ বা ঘোলাটে হওয়া। অর্থাৎ, রক্তের রং দেখল আহত স্থান থেকে নির্গত পানির ন্যায় হলুদবর্ণ, অথবা হলদে ও কালো মিশ্রিত ঘোলাটে, যদি এটা হায়েয চলাকালীন দিনে, অথবা হায়েযের পরে পরেই পবিত্র হওয়ার পূর্বেই দেখে, তাহলে তা হায়েয বলে গণ্য হবে এবং হায়েযের বিধান এতে কার্যকরী হবে। কিন্তু যদি পবিত্রতা অর্জনের পর দেখে, তাহলে তা হায়েয বলে গণ্য হবে না।

৪। কেটে কেটে খুন আসা। যেমন, একদিন রক্ত দেখে আর একদিন পরিষ্কার ইত্যাদি। এর দুটি অবস্থা যথা,

(ক) যদি এটা মহিলার সাথে সব সময় ঘটে থাকে, তাহলে ইস্তিহাযার খুন বলে পরিগণিত হবে এবং ইস্তিহাযার বিধান এতে বাস্তবায়িত হবে।

(খ) এটা সব সময় মহিলার সাথে ঘটে না বরং কখনো কখনো হয় এবং এর পর সে সঠিক পবিত্রাবস্থা পায়। তবে একদিনের কমে যদি খুন বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে পবিত্রা বলে গণ্য হবে না। হ্যাঁ, এমন কোন জিনিস যদি দেখে যা পবিত্রতাকে প্রমাণ করে, তাহলে ভিন্ন কথা। যেমন, যদি তার নিয়মের ঠিক শেষের দিকে খুন বন্ধ হয়, অথবা সে যদি "কাসসাতুল বায়যা" দেখে। আর "কাসসাতুল বায়যা" হলো, সাদা পানি যা হায়েয বন্ধ হওয়ার পর রেহেম থেকে নির্গত হয়।

৫। শুকনো ধরনের রক্ত আসা। অর্থাৎ ঠিক রক্ত নয়, রক্তের দাগ বা চিহ্ন দেখে। এটা যদি হায়েয আসার দিনে, অথবা হায়েয বন্ধ হওয়ার পরে পরেই পবিত্র হওয়ার পূর্বেই দেখে, তাহলে হায়েয বলে গণ্য হবে। আর যদি পবিত্র হওয়ার পর দেখে, তাহলে তা হায়েয হবে না।

মাসিকের বিধান

প্রথমতঃ নামায। হায়েযজনিতা মহিলার উপর ফরয ও নফল প্রত্যেক নামাযই হারাম। কোন নামাযই পড়া ঠিক হবে না। অনুরূপ নামাযগুলির কাযাও তার উপর ওয়াজিব হবে না। তবে যদি হায়েয আরম্ভ হওয়ার পূর্বে অথবা শেষ হওয়ার পর এতটা সময় পায়, যাতে পূর্ণ এক রাকআত নামায আদায় করা সম্ভব, তাহলে সেটা তার উপর ওয়াজিব হবে। যেমন একটি মহিলার সূর্যাস্তের এতটা সময় পর হায়েয আরম্ভ হলো যে, এক রাকআত নামায পড়া যেত, এমতাবস্থায় পবিত্রতা হাসেলের পর তাকে মাগরিবের নামায কাযা করতে হবে। কারণ, সে হায়েযজনিতা হওয়ার পূর্বে এক রাকআত নামায পড়ার মত সময় পেয়ে ছিল। অনুরূপ একটি মহিলার সূর্যোদয়ের এতটা সময় পূর্বে হায়েয থেকে পবিত্র হলো যে, এক রাকআত নামায পড়ার জন্য তা যথেষ্ট ছিল, এমতাবস্থায় পবিত্র অর্জনের পর ফজরের নামায তাকে কাযা করতে হবে। কারণ, হায়েযের পূর্বে এতটা সময় তার হাতে ছিল, যা এক রাকআত নামায পড়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। হ্যাঁ, যিকর, তাকবীর, "সুবহানাল্লাহ" "আলহামদুলিল্লাহ" পাঠ করা, খাবার ইত্যাদির সময় "বিসমিল্লাহ" বলা, ফিক্বাহ ও হাদীস পাঠ করা, দোয়া করা ও দোয়ার উপর আমিন বলা এবং কুরআন শুনা ইত্যাদি কোন কিছুই হায়েযজনিতা মহিলার উপর হারাম নয়। স্বয়ং তার কুরআন পড়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, যদি চোখে দেখে, অথবা মনে মনে পড়ে মুখে উচ্চারণ না করে, তাহলে কোন দোষ নেই। যেমন কুরআন অথবা রেহেল সামনে রেখে তার দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ মনে মনে পড়া। তবে এ অবস্থায় তার কুরআন পাঠ না করাই উত্তম। হ্যাঁ একান্ত প্রয়োজনে পাঠ করতে পারবে। যেমন, সে শিক্ষিকা, ছাত্রীদের অধ্যায়ন করাতে হয়, অথবা পরীক্ষার সময় পরী-

পরীক্ষার জন্য পড়ার প্রয়োজন বোধ করে ইত্যাদি।
দ্বিতীয়তঃ রোযা। হায়েযজনিতা নারীর উপর ফরয ও নফল সব রোযাই হারাম। কোন রোযা রাখা তার পক্ষে ঠিক নয়। তবে ফরয রোযার কাযা তার উপর ওয়াজিব। রোযা রাখা অবস্থায় যদি তার হায়েয আরম্ভ হয়ে যায়, তাহলে তার রোযা বাতিল গণ্য হবে যদিও তা সূর্যাস্তের সামান্য পূর্বে হয়। এদিনের রোযার কাযা করা তার উপর ওয়াজিব, যদি সেটা ফরয রোযা হয়। হ্যাঁ, যদি সে সূর্যাস্তের পূর্বে হায়েয অনুভব করে কিন্তু তা নির্গত হয় সূর্যাস্তের পর, তাহলে তার রোযা সঠিক বলে গণ্য হবে। যদি হায়েয অবস্থায় ফজর হয়ে যায়, তাহলে এ দিনের রোযা শুদ্ধ হবে না, যদিও সে ফজরের সামান্য পরই পবিত্রতা অর্জন করে থাকে। আর যদি ফজরের পূর্বেই পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে তার রোযা সঠিক বলে গণ্য হবে, যদিও সে ফজরের পরে গোসল করে থাকে।
তৃতীয়তঃ কা'বা শরীফের তাওয়াফ করা। ফরয ও নফল সব রকমের তাওয়াফই তার উপর হারাম। কোন তাওয়াফ করা ঠিক হবে না। তাওয়াফ ব্যতীত অন্যান্য কাজ যেমন, সাফা-মারওয়ার সাঈ করা, আরফায় অবস্থান, মুজদালেফা ও মিনায় রাত্রিবাস এবং জামড়াসমূহে কাঁকর মারা ইত্যাদি সহ হজ্জ্ব ও উমরাহর যাবতীয় কাজ সে করতে পারবে। কোন কিছুই তার উপর হারাম নয়। সুতরাং কোন মহিলা যদি পবিত্রাবস্থায় তাওয়াফ আরম্ভ করে, অতঃপর যদি তাওয়াফের পরে পরেই কিংবা সাঈ করার সময় হায়েযের খুন নির্গত হয়, তাহলে এতে কোন দোষ নেই।
চতুর্থতঃ মসজিদে অবস্থান করা তার উপর হারাম।
পঞ্চমতঃ সঙ্গম করা। তার সাথে যৌনবাসনা চরিতার্থ করা তার স্বামীর উপর হারাম এবং স্বামীকে এ সুযোগ দেওয়া তার উপর হারাম। তবে আল্লারই প্রশংসা যে, সঙ্গম ব্যতীত চুমা ও লজ্জাস্থান ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গের সংস্পর্শের মাধ্যমে প্রবৃত্তি নিবারণের অনুমতি রয়েছে।
ষষ্ঠতঃ তালাক। হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া স্বামীর উপর হারাম। যদি সে হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়, তাহলে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যকারী এবং হারাম কাজ সম্পাদনকারী বিবেচিত হবে। এমতাবস্থায় তালাক প্রত্যাহার করা ও পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রাখা তার উপর ওয়াজিব। অতঃপর পবিত্র হয়ে গেলে ইচ্ছা করলে তাকে তালাক দিতে পারবে। তবে উত্তম হলো দ্বিতীয় হায়েয পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দেওয়া। দ্বিতীয় হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে গেলে ইচ্ছা হলে রাখতেও পারে, আবার তালাক দিতেও পারে।
সপ্তমতঃ গোসল ওয়াজিব হওয়া। হায়েয সমাপ্তির পর সর্বাঙ্গ শরীরকে ধুয়ে পবিত্র অর্জন করা তার উপর ওয়াজিব। মাথার বেণী খুলা অপরিহার্য নয়, কিন্তু যদি এমন শক্ত করে বাঁধা থাকে, যাতে আশংকা বোধ করে যে চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছবে না, তাহলে তা খুলতে হবে। যদি নামাযের সময়ের মধ্যে পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে তড়িঘড়ি গোসল করা অপরিহার্য হবে যাতে সময়ে নামাযটা আদায় করতে সক্ষম হয়। যদি সে সফরে থাকে আর কাছে পানি না থাকে, অথবা পানি আছে কিন্তু তার ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা বোধ করে, অথবা সে রোগাক্রান্ত, পানি তাকে ক্ষতি করবে, তাহলে সে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে। অতঃপর আশংকা দূরীভূত হয়ে গেলে গোসল করে নেবে।

ইস্তিহাযাহ

ইস্তিহাযা হলো, হায়েযের পরও রক্ত প্রবাহ অব্যাহত থাকা, বন্ধ না হওয়া, অথবা সাময়িকের জন্য বন্ধ হওয়া। যেমন মাসে মাত্র এক দু'দিনের জন্য বন্ধ হওয়া। কেউ কেউ বলে ১৫দিনের বেশী খুন আসাকে ইস্তিহাযা বলে যদি সেটা তার নিয়ম না হয়।
ইস্তিহাযার তিনটি অবস্থা। যেমন,
১। ইস্তিহাযার পূর্বে তার হায়েযের একটি নির্দিষ্ট সময় ছিল, এমতাবস্থায় সে তার সাবেক নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী

কাজ করতঃ সেই দিনগুলিই হায়েযের দিন গণ্য করবে ও হায়েযের বিধান এতেই কার্যকরী হবে,বাকী অন্য দিনগুলি ইস্তিহাযা বলে বিবেচিত হবে এবং ইস্তিহাযার বিধান তাতে পালনীয় হবে। এর উদাহরন হলো, একটি মহিলার প্রত্যেক মাসের শুরুতেই ছয় দিন খুন আসত, অতঃপর সে ইস্তিহাযায় পতিত হওয়ায় রক্ত প্রবাহ অব্যাহত থাকতে লাগল, এমতাবস্থায় মাসের প্রথম ছয় দিনই তার হায়েয বলে গণ্য হবে আর বাকীগুলি ইস্তিহাযা। তাই সে নির্দিষ্ট দিনগুলিই হায়েয গণ্য করবে। তার পর গোসল করবে ও নামায পড়বে। ছয় দিনের অতিরিক্ত খুনের কোন পারওয়া করবে না।

২। ইস্তিহাযার পূর্বে তার হায়েযের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। অর্থাৎ, যখন থেকে সে খুন দেখেছে, তখন থেকেই তার এই অবস্থা, এমতাবস্থায় যে কটা দিন রক্তের রং কালো অথবা গাঢ় হবে, অথবা এমন গন্ধ, যা হায়েযই প্রমাণ করে, সেই দিন কটিই হায়েয বলে গণ্য হবে। বাকী দিনগুলি ইস্তিহাযা পরিগণিত হবে এবং তাতে ইস্তি-হাযার বিধান আরোপিত হবে। এর উদাহরন হলো, একটি মহিলা প্রথম যে দিন থেকে খুন দেখে সেই দিন থেকেই খুন বন্ধ হয় না। কিন্তু কিছু পার্থক্য সে দেখেছে, যেমন, দশদিন রক্তের রং দেখেছে কালো, বাকী দিনগুলি লাল, অথবা দশদিন রক্তের রং দেখেছে গাঢ়, বাকী দিনগুলি পাতলা, অথবা দশদিন রক্তের গন্ধ হায়েযের মত ছিল, বাকী দিনগুলিতে কোন গন্ধ ছিল না, তাই যে দিনগুলিতে রক্তের রং কালো ও গাঢ় ছিল এবং হায়েযের গন্ধ ছিল, সেই দিনগুলিই হায়েয বলে গণ্য হবে, বাকী ইস্তিহাযা।

৩। তার হায়েযের কোন নির্দিষ্ট সময় ও সঠিক পার্থক্য নেই। যেমন, প্রথম যখন থেকে সে রক্ত দেখেছে, তখন থেকেই তার ইস্তিহাযার খুন অব্যাহত আছে। আর রক্তের রং এক রকম, অথবা এমন বিভিন্ন ধরনের জটিল রক্তের স্বরূপ যাকে হায়েয বলা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় সে অধিকাংশ নারীর নিয়মানুযায়ী কাজ করবে। তাই প্রত্যেক মাসে যখন থেকে সে হায়েয দেখবে, তখন থেকে ছয়দিন বা সাতদিন হায়েয গণ্য হবে, বাকী ইস্তিহাযা।

ইস্তিহাযার বিধান।

ইস্তিহাযার বিধান পবিত্রতার বিধানের মতই, তেমন কোন পার্থক্য নেই। তবে সতমাসা পার্থক্য রয়েছে। তা হলো,

১। প্রত্যেক নামাযের সময় তাকে ওযু করতে হবে।

২। যখন সে ওযুর ইচ্ছা করবে, রক্তের দাগ ধুয়ে নেবে এবং রক্তকে শোষণ করার জন্য লজ্জাস্থানে কোন সুতির কাপড়ের টুকরা রেখে নেবে।

নিফাসের বিধান

সন্তানাদির ভূমিষ্ঠের সময়, অথবা তার দু'দিন বা তিনদিন আগে-পিছে বেদনাজড়িত যে রক্ত রেহেম থেকে বের হয়, তাকেই নিফাসের রক্ত বলে। আর যখনই এই রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তখনই পবিত্রা বলে গণ্য হয়। তবে যদি ৪০দিন অতিক্রম করে, তাহলে সে গোসল করে নেবে। কারন, ৪০ দিনই হলো নিফাসের সর্বশেষ সময় যদিও রক্ত প্রবাহ অব্যাহত থাকে। তবে ৪০ দিনের পর প্রবহমান রক্ত যদি মাসিকের রক্ত হয়, তাহলে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত মাসিকের নিয়ম পালন করবে। তার পর গোসল করবে। আর নিফাস তখনই প্রমাণিত হবে, যখন সৃষ্টের মধ্যে মানব আকৃতির প্রকাশ পাবে। কিন্তু যদি ছোট অসম্পূর্ণ ভ্রুণ হয়, মানব আকৃতির প্রকাশ যদি না থাকে, তাহলে তার রক্ত নিফাসের রক্ত বলে প্রমাণিত হবে না, বরং তা কোন রগের রক্ত বলে গণ্য হবে এবং এমতাবস্থায় ইস্তিহাযার বিধান তাতে কার্যকরী হবে। মানব আকৃতি প্রকাশ হওয়ার সর্ব নিম্ন সময় হলো গর্ভধারণ আরম্ভ থেকে ৮০ দিন। আর সর্বোচ্চ হলো ৯০ দিন। আর নিফাসের বিধান হলো উল্লেখিত মাসিকের বিধানের মত।

মাসিক প্রতিরোধক

মাসিক প্রতিরোধক কোন জিনিস নারী ব্যবহার করতে পারে দুই শর্তের ভিত্তিতে। যেমন,

১। তার ব্যবহারে কোন ক্ষতির আশংকা যেন না থাকে, ক্ষতির আশংকা থাকলে তা জায়েয হবে না।

২। এটা স্বামীর অনুমতিতে হতে হবে যদি তা স্বামীর সম্পর্কিত কোন বিষয় হয়। মাসিক নিয়ে আসে এমন কোন জিনিসও ব্যবহার করতে পারে দুই শর্তের ভিত্তিতে। যেমন,

১। স্বামীর অনুমতি।

২। কোন পালনীয় ওয়াজিব থেকে রক্ষার বাহানায় যেন এ কাজ না করা হয়। যেমন রোযা রাখা ও নামায পড়া ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য ব্যবহার করা।

গর্ভধারন প্রতিরোধক ব্যবহার করা দু'প্রকারের। এক, সব সময়ের জন্য প্রতিরোধ করা এটা জায়েয নয়। দুই, সাময়িকের জন্য প্রতিরোধ করা। যেমন, নারী যদি অত্যাধিক প্রসবকারিনী হয়, আর প্রসব তাকে দুর্বল করে দেয়, তাহলে দু'বছর অন্তর একবার প্রসব হওয়ার ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা ভাল। আর এটা জায়েয তবে স্বামীর অনুমতি থাকতে হবে এবং নারীর যেন কোন ক্ষতির আশংকা না থাকে।

أحكام وآداب إسلامية
ইসলামী আদর্শ ও শিষ্টাচার

১। ইখলাস ও হৃদয়কে বিশুদ্ধ করা ও মনে সর্বদা আল্লাহর ভয় রাখা

قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ البينة ٥

আল্লাহ ত'য়ালা বলেন, "তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা একনিষ্ঠ হয়ে আন্তরিক-ভাবে আল্লাহর দ্বীন পালনের মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই এবাদত করবে"। (৯৮:৫)

وقال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾ الزمر ١٤

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, "বলে দাও, আমি তো নিজের দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খাটি করে তাঁরই এবাদত বন্দেগী করব"। (৩৯:১৪)

وقال: ﴿قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾ آل عمران ٢٩

তিনি আরো বলেন, "হে নবী বলে দাও, তোমাদের মনে যা কিছু আছে, তা গোপন কর আর প্রকাশ কর, আল্লাহ সব কিছুই জানেন"। (৩:২৯)

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ آل عمران٥

তিনি আরো বলেন, "আসমান ও যমিনের কোন জিনিসই আল্লাহর নিকট গুপ্ত নয়। (৩:৫)

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت الرسول ﷺ يقول: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى...)

আমীরুল মু'মেনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, সমস্ত কাজের ফলাফল নিয়ত অনুযায়ী হবে। প্রত্যেকেই যে নিয়তে কাজ করবে, সে তা-ই পাবে"।(বুখারী-মুসলিম)

((وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.) البخاري

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিবসে আমার সুপারিশ দ্বারা সব চেয়ে বেশী ধন্য হবে ঐ ব্যক্তি, যে একনিষ্ঠভাবে অন্তর থেকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে"।

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.) رواه مسلم

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চেহারার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না বরং তোমাদের মনের ও কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করেন"। (মুসলিম)

وعن أبي ذر رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ، قال: (اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.) الترمذي

আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ বলেছেন, "সর্বত্র আল্লাহকে ভয় কর, মন্দ ও অসৎ কাজ হয়ে গেলে সৎ কাজ কর তা পাপ কাজকে মুছে দেবে এবং মানুষের সাথে সদাচারণ কর"। (মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। আমল আল্লাহর দরবারে গৃহীত হওয়ার জন্য ইখলাস তথা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কোন কিছু করা পূর্বশর্ত। অনুরূপ দ্বিগুণ প্রতিদান পাওয়াও তার উপর নির্ভর করে।

২। নিঃসন্দেহে আল্লাহত'য়ালা শির্ক থেকে বহু উর্ধ্বে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কৃত আমল ব্যতীত কিছু গ্রহণ করেন না। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় আমলে আমার সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার বানাবে, আমি তাকে তার শিরক সহ বর্জন করব।

৩। খোদাভীতি অর্জন এবং আল্লাহকে সর্বাবস্থায় সকল কিছুর পর্যবেক্ষক বলে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। কেননা, আকাশ ও যমীনে কোন জিনিস তাঁর অগোচরে নয়।

(২) শির্ক থেকে সতর্ক ও তাওহীদের মাহাত্ম্য

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ لقمان ١٣

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "নিশ্চয় শির্ক অতি বড় যুলুমের কাজ"। (৩১ঃ ১৩)

وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ النساء ٤٨

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "আল্লাহ কেবল শির্কের গুনাহ মাফ করবেন না, শির্ক ব্যতীত আর যত গুনাহ আছে তা যার জন্য ইচ্ছা মাফ করে দিবেন"। (৪ঃ ৪৮)

وقال: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ الزمر ٦٥

তিনি আরো বলেন "তোমার প্রতি ও তোমার পূর্বে গত হওয়া সমস্ত নবী-রাসূলদের প্রতি এই অহী পাঠানো হয়েছে যে, তুমি যদি শির্ক কর, তাহলে তোমার আমল নষ্ট হয়ে যাবে, আর তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে"। (৩৯ঃ৬৫)

وقال: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ الذاريات ٥٦

তিনি আরো বলেছেন, "আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নাই, কেবল এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার বান্দেগী করবে"। (৫১ঃ৫৬)

وقال: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ النحل ٣٦

তিনি আরো বলেন, "আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। আর তাঁর সাহায্যে সকলকে সাবধান করে দিয়েছি যে, আল্লাহর বান্দেগী কর এবং তাগুতের বান্দেগী থেকে দূরে থাক"। (১৬ঃ৩৬)

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.) أخرجه مسلم

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"যে ব্যক্তি শির্ক করা ব্যতিরেকে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হতে পারবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে শির্ক নিয়ে উপস্থিত হবে, সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে"।(মুসলিম)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله...) الحديث، متفق عليه

আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,ধ্বংসকারী সাতটি বস্তু থেকে বাঁচো! সাহাবারা জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই সাতটি বস্তু কি কি? তিনি উত্তরে বলেন,আল্লাহর সহিত শির্ক করা---।(বুখারী-মুসলিম)

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف ﷺ على حمار فقال: (يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا...) البخاري ومسلم.

মাআয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি গাধার উপরে আল্লাহর নবীর পশ্চাতে বসে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহর রাসূল আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে মাআয! বান্দাদের উপর আল্লাহর এবং আল্লাহর উপর বান্দাদের অধিকার কি জান? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক তথা অধিকার হলো এই যে, তারা এবাদত করবে শুধু মাত্র তাঁরই এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করবে না। আর আল্লাহর কাছে বান্দার আবদার হলো এই যে, তিনি শির্কমুক্ত বান্দাকে শাস্তি দেবেন না"।(বুখারী-মুসলিম)

<u>উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী</u>

১। শির্কের গুনাহ এত ভয়ংকর যে, তাওবা করা ব্যতীত আল্লাহ তা মাফ করবেন না, যেমন অন্যান্য পাপসমূহ ইচ্ছে করলে আল্লাহ মাফ করে দিবেন।

২। যে শির্কের উপর মৃত্যু বরণ করবে, তার আমল যেমন পন্ড ও বিফল হবে, তেমনি দোযখই অনন্ত-অশেষ কালের জন্য হবে তার অবধারিত পরিণতি।

৩। এতে তাওহীদ তথা একত্ববাদের মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয়, যা ছিল জ্বিন ও মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য এবং জান্নাত লাভ ও দোযখ থেকে মুক্তির প্রধান পূর্বশর্ত।

(৩) লোক প্রদর্শন করে আমল করার ভয়াবহতা এবং তা হলো শির্ক

قال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ الماعون:4

মহান আল্লাহ বলেন, "ধ্বংস সেই নামাযীদের জন্য যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর কাজ করে, আর সাধারণ প্রয়োজনের জিনিস দেওয়া হতে বিরত থাকে"। (১০৭:৪-৭)

وعن أبي سعيد بن فضالة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك.)

আবু সায়ীদ বিন ফুযালাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, "যখন আল্লাহ পূর্বাপর সকলকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যে দিনের ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, সেদিন একজন ডাক দিয়ে বলবে, যে স্বীয় কর্মে আল্লাহর সহিত অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করেছিল, সে যেন তার কর্মের প্রতিফল ও প্রতিদান তারই নিকট কামনা করে,কারন আল্লাহ শির্ককারীদের আরোপিত শির্ক থেকে একেবারে মুক্ত ও সম্পর্কহীন"। (তিরমিযী)

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا بلى يا رسول الله، فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه)

আবু সায়ীদ খুদরী(রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকটে উ-পস্থিত হলেন, যখন আমরা দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন,তোমাদেরকে কি এমন জিনিসের সংবাদ দিব না, যেটা আমার নিকটে দাজ্জাল থেকেও অধিক ভয়াবহ? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন! তিনি বললেন, তা হলো, ক্ষুদ্র বা লঘু শির্ক। কোন ব্যক্তি নামায পড়তে দাঁড়ায় এবং এই মনে করে অতি সুন্দর ভাবে নামায আদায় করে যে, কোন লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে"। (ইবনে মাজা)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। রিয়া বা লোক প্রদর্শন করে আমল করার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা এবং কঠোর ভাবে তা থেকে সতর্ক করা, কারন রিয়াকারীর জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।
২। কোন কোন সময় মানুষ রিয়ার মধ্যে পতিত হয় অথচ সে অনুভব করতে পারেনা।
৩। লোক দেখানো আমল প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং তা গ্রহণযোগ্য হয় না।

(৪) দো'আ

قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ غافر ٦٠

মহান আল্লাহ বলেন, "তোমাদের রব বলেন,আমাকে ডাক আমি তোমাদের দো'আ কবুল করি"। (৪০: ৬০)

و قال: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.. ﴾ البقرة ١٨٦

তিনি আরো বলেন, "হে নবী! আমার বান্দা যদি তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তবে তাদের বলে দাও যে, আমি তাদের অতি নিকটে। আমাকে যে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকি"। (২: ১৮৬)

وقال: ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ الأعراف ٥٥

وعن أبي سعيد بن فضالة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك.)

আবু সাঈদ বিন ফুযালাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, "যখন আল্লাহ পূর্বাপর সকলকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যে দিনের ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, সেদিন একজন ডাক দিয়ে বলবে, যে স্বীয় কর্মে আল্লাহর সহিত অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করেছিল, সে যেন তার কর্মের প্রতিফল ও প্রতিদান তারই নিকট কামনা করে,কারণ আল্লাহ শির্ককারীদের আরোপিত শির্ক থেকে একেবারে মুক্ত ও সম্পর্কহীন"। (তিরমিযী)

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا بلى يا رسول الله، فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه)

আবু সাঈদ খুদরী(রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকটে উপস্থিত হলেন, যখন আমরা দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন,তোমাদেরকে কি এমন জিনিসের সংবাদ দিব না, যেটা আমার নিকটে দাজ্জাল থেকেও অধিক ভয়াবহ? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন! তিনি বললেন, তা হলো, ক্ষুদ্র বা লঘু শির্ক। কোন ব্যক্তি নামায পড়তে দাঁড়ায় এবং এই মনে করে অতি সুন্দর ভাবে নামায আদায় করে যে, কোন লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে"। (ইবনে মাজা)

<u>উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী</u>

১। রিয়া বা লোক প্রদর্শন করে আমল করার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা এবং কঠোর ভাবে তা থেকে সতর্ক করা, কারণ রিয়াকারীর জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।
২। কোন কোন সময় মানুষ রিয়ার মধ্যে পতিত হয় অথচ সে অনুভব করতে পারেনা।
৩। লোক দেখানো আমল প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং তা গ্রহণযোগ্য হয় না।

(৪) দো'আ

قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ غافر ٦٠

মহান আল্লাহ বলেন, "তোমাদের রব বলেন,আমাকে ডাক আমি তোমাদের দো'আ কবুল করি"। (৪০: ৬০)

و قال: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.. ﴾ البقرة ١٨٦

তিনি আরো বলেন, "হে নবী! আমার বান্দা যদি তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তবে তাদের বলে দাও যে, আমি তাদের অতি নিকটে। আমাকে যে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকি"। (২: ১৮৬)

وقال: ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ الأعراف ٥٥

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "তোমাদের রবের নিকট প্রার্থনা কর কাকুতি-মিনতি সহকারে ও চুপে চুপে, নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না"। (৭:৫৫)

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (الدعاء هو العبادة.)

নো'মান বিন বাশীর থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দো'য়াই হলো এবাদত "। (তিরমিজী-আবু দাউদ)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء.)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,বান্দা সেজদারত অবস্থায় তাঁর রবের সব চেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়। সুতরাং সেজদায় বেশী বেশী দো'আ কর"। (মুসলিম)

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ﷺ يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك)

আয়েশা রাযী আল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আর মধ্যে জামে (বহুল অর্থ বিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত দো'য়া) পছন্দ করতেন এবং এছাড়া অন্য সব দো'য়া পরিহার করতেন" (আবু দাউদ)

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (ما من عبد مسلم يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو ادخر الله له في الآخرة خيرا منه، أو كف عنه من السوء مثله مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم)

ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যখন কোন মুসলিম বান্দা আল্লাহর কাছে কোন জিনিসের প্রার্থনা করে, তখন হয়তো আল্লাহ তাকে উক্ত জিনিস দান করেন, অথবা আখেরাতে তার জন্য এর চেয়ে উত্তম বস্তু সুরক্ষিত রাখেন, অথবা সেই ধরণের কোন অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন, যতক্ষণ না সে কোন পাপ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দো'য়া করে"।

وعنه أن رسول الله ﷺ كان يقول: (دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكّل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل)

উক্ত সাহাবা থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলমানের দোআ তার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন দায়িত্বশীল ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে, যখনই সেই ব্যক্তি তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্য কোন দো'য়া করে, তখনই ঐ দায়িত্বশীল ফেরেশতা বলে,আমিন। তোমার জন্যও অনুরূপ"। (মুসলিম)

<u>উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী</u>

১। দো'য়া যেহেতু এবাদত বিধায় আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে তা করা চলেনা। আর যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে দো'য়া করবে, তার এই দো'য়া শির্কে পরিণত হবে। জেনে রেখো, দো'য়ার বিরাট মর্যাদা রয়েছে। রাসূল (সাঃ) দো'য়াকে এবাদত বলে গণ্য করেছেন, অর্থাৎ এবাদতের মহান রুকন।

২। ধীরস্থিরভাবে কোন শব্দ না করে দো'য়া করা মুস্তাহাব। তেমনি জামে বাক্য দ্বারা দো'য়া করাও মুসতাহাব। অর্থাৎ বহুল অর্থ বিশিষ্ট স্বল্প বাক্য দ্বারাই দোআ করা বিধেয়।

৩। মানুষকে তার জান-মাল ও সন্তানাদির উপর অভিশাপ করা থেকে সতর্ক করা।

৪। অনুপস্থিত মুসলমানদের জন্য দো'য়া করা মুসতাহাব।
৫। আল্লাহ প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করলে এটা জরুরী নয় যে, সাথে সাথেই তাকে তা দান করবেন, বরং কখনো তার দো'যার দরুন কোন অনিষ্টকারিতা তার থেকে দূর করেন, অথবা আখেরাতে তাকে দেয়ার জন্য তা সুরক্ষিত রাখেন, যে দিন প্রতিফলের অত্যধিক প্রয়োজন বোধ করবে।

(৫) ইলম

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ الزمر ٩

মহান আল্লাহ বলেন, "ওদের বল, যারা জানে এবং যারা জানেনা এই উভয়দল কখনো সমান হতে পারে না?"। (৩৯:৯)

وقال: ﴿ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.﴾المجادلة١١

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন"। (৫৮:১১)

وقال:﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا.﴾ طه ١١٤.

"বল, হে পরোয়ারদিগার! আমাকে আরো অধিক জ্ঞান দান কর"। (২০:১১৪)

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.﴾ فاطر ٢٨

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল ইলম সম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে"। (৩৫:২৮)

وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.)

মুআবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের তত্ত্বজ্ঞান দান করেন"।(বুখারী-মুসলিম)

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (من علّم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء.)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন ইলম শেখালো, সে ততটাই প্রতিদান পাবে, যতটা আমলকারী পাবে। আর আমলকারীর প্রতিদানে কোন ঘাটতি আসবে না"। (ইবনে মাজা)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,আদমের কোন সন্তান যখন মারা যায়, তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমলের সাওয়াব পেতে থাকে। সাদকায়ে জারিয়াহ, এমন ইলম যদ্দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং সুসন্তান যে তার জন্য দো'য়া করে"।(মুসলিম)

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: (والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك

من حمر النعم)

সাহল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"আল্লাহর শপথ! তোমার মাধ্যমে কোন একটি লোককেও যদি আল্লাহ হেদায়াত দান করেন, তাহলে তা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম"। (বুখারী)

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: (بلغوا عني ولو آية)

আব্দুল্লাহ বিন আমরু বনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"আমার কাছ থেকে একটি বাক্য হলেও তা লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও"। (বুখারী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহে ইলম ও ওলামায়ে কেরামদের মর্যাদার কথাই বলা হয়েছে। যে দ্বীনের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, তার জন্য আল্লাহর কল্যাণকামিতাই প্রমাণ করে। অনুরূপ জ্ঞান অন্বেষণ করা জান্নাত লাভের অন্যতম কারণও বটে।

২। মানুষকে শিক্ষাদান ও সৎপথ প্রদর্শন করা এবং স্বল্প হলেও জ্ঞান প্রচারের প্রতিদান অনেক অনেক বেশী। আর তা মৃত্যুর পরেও মানুষের কাজে আসবে।

৩। নফল এবাদতের চেয়ে ইলম তথা জ্ঞানার্জন করা উত্তম ও শ্রেয়।

৪। সন্তানাদিদের সৎ ও উত্তম তারবীয়াতের প্রতি আগ্রহী হওয়া আবশ্যক।

(৬) ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান

قال الله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ آل عمران

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "দুনিয়ার সর্বোত্তম দল তোমরা, যাদেরকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখ এবং খোদার উপর ঈমান রক্ষা করে চল"। (৩ঃ ১১০)

وقال: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾
ال عمران ١٠٤

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতে হবে, যারা নেকী ও মঙ্গলের দিকে ডাকবে, ভাল ও সৎকাজের আদেশ দিবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখবে। যারা এই কাজ করবে তারাই সার্থকতা পাবে"। (৩ঃ ১০৪)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.) أخرجه مسلم.

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ হতে দেখবে, সে যেন তা হাত দ্বারা রোধ করে, হাত দ্বারা রোধ করার শক্তি না থাকলে, জিহবা দ্বারা, তারও শক্তি না থাকলে, সে কাজকে অন্তরে ঘৃণা

করবে। আর এটা ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা" । (মুসলিম)

وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم.) أخرجه الترمذي.

হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সেই আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার জান! তোমরা অবশ্যই অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান কর, অন্যথায় তোমাদের উপরে আযাব প্রেরণ করা হবে তখন তোমরা আল্লাহকে ডাকলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেওয়া হবে না"।

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه.) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

আবু বাকার সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, "মানুষ অত্যাচারীকে দেখা সত্তেও যদি তার হস্তদ্বয় ধরে তাকে অত্যাচার করা থেকে বিরত না রাখে, তাহলে সকলেই আল্লাহর আযাবের শিকার হবে"। (আবু দাউদ, তিরমিজী ও নাসায়ী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান করা সাফল্যের উপকরণ।

২। যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ হতে দেখবে, সাধ্যানুসারে সে কাজে বাধা প্রদান করা তার উপর ওয়াজিব।

৩। সাধ্যবান ব্যক্তিই হাত দ্বারা বাধা প্রদান করবে, যেমন বাড়ীতে পিতা, অথবা শাসক, অথবা শাসক কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি।

৪। অন্তর থেকে বাধা প্রদানকারীকে অন্যায়কে ঘৃণা করা এবং তা থেকে পৃথক থাকা অপরিহার্য।

৫। ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান না করা, দো'য়া কবুল না হবার এবং আল্লাহর আযাবের কারণ।

(৭) ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদানের আদবসমূহ

قال الله تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ النحل ١٢٥

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "হে নবী! তোমার খোদার পথের দিকে দাওয়াত দাও হিকমত ও উত্তম নসিহতের সাহায্যে। আর লোকদের সহিত পরস্পর বিতর্ক কর এমন পন্থায় যা অতি উত্তম"। (১৬:১২৫)

وقال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ آل عمران ١٥٩

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "হে নবী! এটা খোদার বড় অনুগ্রহের বিষয় যে, তুমি এই সব লোকের জন্য খুবই নম্র স্বভাবের লোক হয়েছ। অন্যথায় তুমি যদি উগ্র স্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতে, তাহলে এই সব লোক তোমার চতুর্দিক হতে দূরে সরে যেত"। (৩:১৫৯)

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ: (إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله.) متفق عليه.

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ

অনুগ্রহপরায়ণ ও কোমল তাই তিনি প্রতিটি কাজে বিনয়, কোমলতা ও নম্র আচরণ পছন্দ করেন"। (বুখারী

و عن عائشة أن النبي ﷺ قال: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه.)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে জিনিসে কোমলতা থাকে, কোমলতা সেটিকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে দেয়। আর যে জিনিস থেকে কোমলতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়, সেটা দোষ ও ত্রুটিযুক্ত হয়"। (মুসলিম)

وعن جرير بن عبد الله قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من يحرم الرفق يحرم الخير كله.) رواه مسلم.

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যাকে কোমলতা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে সব রকমের কল্যান থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছে"। (মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কোমলতা ও নম্র আচরণের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা, এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ ও অন্যান্য সকল দাওয়াতী কাজে হিকমত অবলম্বন করা।

২। প্রতিটি বিষয়ে সদয় ও নম্র হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা, যে সদয় ও নম্র ব্যবহার থেকে বঞ্চিত সে প্রত্যেক কল্যান থেকে বঞ্চিত।

(৮) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা

قال الله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾ العنكبوت ٨

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আমি মানুষকে নিজের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি"। (২৯:৮

وقال سبحانه: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ الإسراء ٢٣

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "তোমার প্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা কেবল মাত্র তাঁরই এবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তোমাদের কাছে কোন একজন অথবা উভয়েই যদি বৃদ্ধাবস্থায় থাকে, তবে তোমরা তাদেরকে 'উঃ' পর্যন্ত বলবে না, তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না, বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা সহকারে কথা বলবে"। (১৭:২৩)

وقال سبحانه: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ... ﴾ لقمان ١٤

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। *তার মা কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করে তাকে স্বীয় উদরে বহন করেছে। অতঃপর তাকে একাধারে দু'বছর দুগ্ধ* পান করিয়েছে। অতএব আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক এবং সাথে সাথে পিতা-মাতার প্রতিও। (৩১:১৪)

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي ﷺ: أي العمل أفضل؟ قال:(الصلاة على وقتها.)

قلت ثم أي؟ قال: (بر الوالدين.) قلت ثم أي؟ قال: (الجهاد في سبيل الله.)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন কাজটি আল্লাহর কাছে সব চেয়ে বেশী উত্তম? তিনি বললেন, যথা সময়ে নামাজ আদায় করা। আমি পুনরায় বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন,পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা"। (বুখারী-মুসলিম)

و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: (أمك.) قال ثم من؟ قال: (أمك.) قال ثم من؟ قال: (أمك.) قال ثم من؟ قال: (أبوك.)

আবুহুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লার রাসূল! মানুষের মধ্যে আমার সদ্ব্যবহার ও সুন্দর আচরণের অধিকতর অধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে পুনরায় বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা"।(বুখারী-মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ইসলাম পিতা-মাতার যথাযথ মর্যাদা সুনিশ্চিত করে তাদের আনুগত্য ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে।

২। যথাসময়ে নামায আদায় করার পর আল্লাহর কাছে সব চাইতে প্রিয় আমল হচ্ছে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

৩। তাদের অবাধ্যতা, এবং তাদের সাথে রূঢ় কথা বলা এমনকি 'উঃ' পর্যন্ত বলার ব্যাপারে কঠোর নিষেধ করা হয়েছে।

৪। আনুগত্য ও সদ্ব্যবহারে মায়ের অধিকার বাপের চেয়ে বেশী।

(৯) সচ্চরিত্রতা

قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. ﴾ القلم ٤

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "নিশ্চয় তুমি নৈতিকতার উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত"। (কালামঃ ৪)

وقال الله تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. ﴾ آل عمران ١٥٩

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "হে নবী! খোদার বড় অনুগ্রহের বিষয় যে, তুমি এসব লোকের জন্য নম্র স্বভাবের লোক হয়েছ। অন্যথায় তুমি যদি উগ্র স্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতে, তবে এসব লোক তোমার চতুর্দিক হতে সরে যেতো"। (৩ঃ১৫৯)

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء.)

আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিবসে বান্দার আমলের দাঁড়ি-পাল্লায় সচ্চরিত্রতার চেয়ে কোন অন্য বস্তু অধিক ভারী হবে না। আর আল্লাহ অশ্লীলভাষী ও বদমেজাজীকে ঘৃণা করেন"।

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله ﷺ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: (تقوى الله وحسن الخلق.)

আবুহুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কোন বস্তু অধিকহারে মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি বললেন, 'খোদাভীতি ও সচ্চরিত্র'।

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم.)

আবুহুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মুমেনগণের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানদার সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সব চেয়ে বেশী উন্নত এবং তোমাদের মধ্যে স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহারকারী ব্যক্তিরা সর্বাপেক্ষা উত্তম"। (তিরমিজী)

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় মুমিন মহৎচরিত্রের গুণে রাত জেগে এবাদতকারী রোজাদারের মর্যাদা পায়"। (আবু দাউদ)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। রাসুলের উন্নত নৈতিকতা ও চারিত্রিক মাহাত্ম্যের বর্ণনা।

২। সচ্চরিত্রের মর্যাদা ও তাৎপর্য এত যে, এটাই জান্নাত লাভ ও মর্যাদা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। আর এটাই বেশী সংখ্যক মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। কেয়ামত দিবসে আমল মাপা হবে এবং তাতে সচ্চরিত্র ও খোদাভীতি সর্বাধিক ভারী হবে।

৩। সুন্দর কথা ও কাজের উপর ইসলাম সকলকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছে এবং অশ্লীল বচনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

৪। স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে সুন্দর জীবন-যাপন ও সদাচারণের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।

৫। ঈমান পুণ্যময় কাজের ফলে বৃদ্ধি পায় এবং পাপের কারণে হ্রাস পায়।

(১০) কোমলতা ও ধীরস্থিরতা

قال الله تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "হে নবী! খোদার বড় অনুগ্রহের বিষয় যে তুমি এসব লোকের জন্য নম্র স্বভাবের লোক হয়েছ, অন্যথায় তুমি যদি উগ্রস্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতে, তবে এসব লোক তোমার চতুর্দিক হতে দূরে সরে যেত"। (৩:১৫৯)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: (إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله.)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিঃসন্দেহে আল্লাহ অনুগ্রহপরায়ণ ও কোমল। তাই তিনি প্রত্যেক জিনিসে কোমলতা ও নম্র আচরণ পছন্দ করেন"। (বুখারী মুসলিম)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ لأشج عبد القيس: (إن فيك خصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة.)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশাজ্জে আব্দুল কায়েসকে বলেছিলেন, তোমার মধ্যে এমন দু'টি গুণ বা অভ্যাস রয়েছে, যা স্বয়ং আল্লাহও পছন্দ করেন ও ভাল বাসেন। একটি হলো ধৈর্য ও সহনশীলতা, অপরটি হলো ধীরস্থিরতা"। (মুসলিম)

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه.)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে জিনিসে কোমলতা থাকে, কোমলতা সেটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দেয়। আর যে জিনিস থেকে কোমলতা ছিনিয়ে নেওয়া হয় সেটা দোষ ও ত্রুটিযুক্ত হয়"। (মুসলিম)

وعن جرير بن عبد الله قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من يحرم الرفق يحرم الخير كله.)

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলতেন, যাকে কোমলতা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে সব রকমের কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছে"। (মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কোমলতা আল্লাহর পছন্দনীয় বস্তু এবং কোমলতা ও সহনশীলতাই কল্যাণ টেনে আনে।

২। সৃষ্ট জীবের সাথে সদয় ভাব, নম্র আচরণ ও সহানুভূতি জান্নাতী লোকের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও গুণ।

৩। ক্রোধ ও উগ্রস্বভাব থেকে বাঁচা তথা ধৈর্য ও সহনশীলতার বড় তাৎপর্য।

(১১) দয়া দাক্ষিণ্য

قال الله تعالى عن نبيه محمد ﷺ: ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ التوبة ١٢٨

আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় নবী সম্পর্কে বলেন, "মুমিনগণের জন্য তিনি সহানুভূতি সম্পন্ন ও করুণাসিক্ত'।

وقال عن المؤمنين: ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ الفتح ٢٩

আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনগণের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তারা পরস্পর পরস্পর দয়াশীল ও মমতাময়"। (ফাঃ২৯)

عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ: (لا يرحم الله من لا يرحم الناس.) متفق عليه.

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শন করে না, আল্লাহ তাকেও অনুগ্রহ করবে না"। (বুখারী-মুসলিম)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق ﷺ يقول: (لا تنزع الرحمة إلا من شقي.) أخرجه أحمد والترمذي.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি সত্যবাদী নবী আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'দয়া শুধু মাত্র দুর্ভাগা লোক থেকেই ছিনিয়ে নেওয়া হয়'। (আহমদ ও তিরমিজী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। দয়া মুসলিমদের মহৎ গুণ।
২। মানুষকে দয়া করা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তির পূর্বশর্ত।
৩। অন্তর হতে দয়া লোপ পাওয়া ব্যক্তির দুর্ভাগ্যের পরিচয়।

(১২) যুলুম করা হারাম

قال الله تعالى: ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ غافر ١٨

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "জালেমদের জন্য কেউ দরদী ও সহানুভূতিশীল বন্ধু হবে না, আর না কোন সুপারিশকারী হবে, যার কথা মেনে নেওয়া হবে"। (৪০ঃ ১৮)

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ﷺ فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا ...) الحديث. رواه مسلم.

আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, "হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর যুলুমকে হারাম করে রেখেছি এবং তোমাদের মধ্যেও তা হারাম করেছি। কাজেই তোমরা একে অপরের প্রতি যুলুম করো না"।(মুসলিম)

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (اتقوا الظلم فإنه الظلم ظلمات يوم القيامة...)

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,যুলুম করা থেকে দূরে থাক। কেননা, যুলুম কেয়ামতের দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন ধোঁয়ায় পরিণত হবে"। (মুসলিম)

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث بعثه إلى اليمن أن رسول الله ﷺ قال: (واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.) متفق عليه.

মু'আয (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মযলুম তথা নির্যাতিত লোকের অভিশাপকে ভয় কর, কেননা তার দো'য়া ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল নেই"। (বুখারী-মুসলিম)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله من قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.) أخرجه البخاري.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোন ব্যক্তির উপর তার অপর ভাইয়ের যদি কোন দাবী থাকে, আর তা যদি তার মান-মর্যাদার উপর অথবা অন্য কিছুর উপর যুলুম নির্যাতন সম্পর্কিত হয়, তবে সে যেন আজই কপর্দকহীন নিঃস্ব হওয়ার পূর্বে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে নেয়। অন্যথায় (কেয়ামতের দিন) তার যুলুমের সমপরিমাণ নেকী তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে।

যদি তার নেকী না থাকে, তবে তার প্রতিপক্ষের গুনাহ থেকে যুলুমের সমপরিমাণ তার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হবে"। (বুখারী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। যুলুম হারাম এবং তৎসম্পর্কে কঠোর বাণী ঘোষিত হয়েছে।
২। ইহকালে ও পরকালে নির্যাতনকারীর অশুভ পরিণাম ও কঠিন শাস্তি রয়েছে।
৩। নির্যাতিত ব্যক্তির দো'য়া (অভিশাপ) আল্লাহ রদ করেন না।

(১৩) মুসলমানের রক্তের মান-মর্যাদা

قال الله تعالى ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ﴾

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "যে ব্যক্তি জেনে বুঝে ও স্বেচ্ছায় কোন মুমিনকে হত্যা করল, তার শাস্তি হলো জাহান্নাম, যাতে সে চির দিন অবস্থান করবে। তার উপর আল্লাহর আযাব ও অভিশাপ বর্ষিত হয়। আর তিনি তার জন্য কঠোর শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন"। (৪ঃ৯৩)

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম রক্তপাত ও খুন সম্পর্কেই মানুষের মাঝে ফয়সালা করা হবে"। (বুখারী-মুসলিম)

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: (لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم.)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'একজন মুসলমানের হত্যার চেয়ে গোটা পৃথিবীটাই বিলীন হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট সহজ ও শ্রেয়"। (তিরমিজী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মুসলমানের হত্যা সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হয়েছে এবং আল্লাহর নিকট মুসলমানের মান-মর্যাদার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।
২। রক্তপাতের গুনাহ অতীব তিব্র হওয়ায় সে সম্পর্কেই কিয়ামতের দিন প্রথম বিচারকার্য সম্পাদিত হবে।
৩। ঘাতকের পার্থিব শাস্তি হলো তাকে হত্যা করা এবং পরকালে জাহান্নামে চিরতরে অবস্থান।

(১৪) মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকার

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ الحجرات ١٠

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "মুমেনরা তো পরস্পরের ভাই"। (৪৯ঃ ১০)

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.)

আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "একজন মুমেন অন্য মুমেনের জন্য নির্মিত ঘরের মত যার একাংশ অন্যাংশকে শক্তি যোগায়"। (বুখারী)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا

يخذله (يترك نصرته) كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا، بحسب امرء من الشر (أي يكفيه من الشر) أن يحقر أخاه المسلم.)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলমানরা আপসে ভাই ভাই, কেউ কারো খিয়ানত করবে না, কেউ কারো সাথে মিথ্যা বলবে না এবং কেউ কারো সহযোগিতা থেকে দূরে থাকবে না। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, ধন-সম্পদ, ও মান-মর্যাদা অন্য মুসলমানের জন্য হারাম। খোদা ভীতির সম্পর্ক অন্তরের সাথে। কোন মুসলমান ভাইকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা পাপ ও অন্যায় বলে পরিগনিত হওয়াতে যথেষ্ট"। (তিরমিজী)

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমেন হতে পারবে না, যতক্ষণ সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জনাও তা না করবে" । (বুখারী)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ কষ্টকে দূরীভূত করবে, আল্লাহ তার থেকে কেয়ামতের দুঃখ কষ্টকে দূর করবেন। আর যে কোন সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন ব্যক্তির সংকীর্ণতাকে দূর করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার সংকীর্ণতাকে দূর করবেন, আর যে কোন মুসলমানের গোপন দোষকে ঢেকে রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার গোপন দোষকে ঢেকে রাখবেন, আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তার বান্দার সহযোগিতায় থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভায়ের সহযোগিতায় থাকে"। (তিরমিজী)

<u>উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী</u>

১। মুমেনরা আপসে ভাই ভাই। ছোট হোক আর বড় হোক, শাসক হোক অথবা শাসিত।
২। মুসলমানদেরকে একে অপরের সহযোগিতার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং অন্যায় ব্যতীত প্রত্যেক সহযোগিতার মুখাপেক্ষী ব্যক্তির সহযোগিতা করার কথা বলা হয়েছে।
৩। অভাবীদের সহযোগিতার অনেক মাহাত্ম্য ও প্রচুর সাওয়াব রয়েছে।

(১৫) <u>প্রতিবেশীর অধিকার</u>

قال الله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ النساء ٣٦

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,
মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর,নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও নিঃস্ব মিসকীনদের প্রতিও এবং প্রতিবেশী আত্মীয়ের

প্রতি, আত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, পাশা-পাশি চলার সাথী, পথিক ও অধীনস্থ দাস-দাসীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর"। (নিসাঃ৩৬)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن!) قيل: من يا رسول الله؟ قال: (الذي لا يأمن جاره بوائقه.)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর শপথ! সে মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ! সে মুমিন নয়; আল্লাহর শপথ! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়"। (বুখারী)

و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার অতিথিকে সাদরে গ্রহণ করে আপ্যায়ন করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নীরব থাকে"। (বুখারী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ ও সদ্ব্যবহার সহ তার কোন অনিষ্ট সাধন না করতে তাকিদ করা হয়েছে।
২। ঈমানের পূর্ণতা লাভের দাবীই হলো প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার করা এবং তার কোন অনিষ্ট না করা যদিও সে অমুসলিম হয়।

(১৬) জিভের ভয়াবহতা

قال الله تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ ق ١٨

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "যে শব্দই তার মুখে উচ্চারিত হয়, তা সংরক্ষণের জন্য একজন সদা প্রস্তুত পর্যবেক্ষক নিযুক্ত রয়েছে"। (৫০ঃ ১৮)

وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا.﴾ الإسراء ٣٦

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "এমন কোন জিনিসের পেছনে লেগোনা, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, নিশ্চিত জেনে রাখ, চোখ, কান ও অন্তর সব কিছুর গুনাহের জওয়াবদিহি করতে হবে"। (১৭ঃ৩৬)

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (سئل رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.)

আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, মুসলমানদের মধ্যে কে সর্বোত্তম? তিনি বললেন, যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে। তিরমিজী)

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: (من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة.)

সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাকে তার দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিস (জিহবা)–এর এবং দু'পায়ের মধ্যবর্তী জিনিস (যৌনাঙ্গ)–এর হেফাজতের নিশ্চয়তা দিতে পারবে, আমি তার বেহেশতের জন্য যামিন হতে পারি। (বুখারী)

و عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ يقول: (إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, বান্দা অনেক সময় কোন বিচার বিবেচনা না করেই, এমন কথা বলে ফেলে, যার কারণে সে নিজেকে জাহান্নামের এত দূর গভীরে নিয়ে যায়, যা পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের সমান"। (বুখারী)

<u>উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী</u>

১। জিহবার গুরুত্ব ও আশংকা খুবই বেশী। বিধায় তা থেকে সতর্ক থাকা অপরিহার্য। (মানুষ কোন কোন সময়) বিবেচনা না করে দ্বিধাহীন কণ্ঠে একটি কথা বলার কারণে জাহান্নামে পতিত হয়। ইবাদত ব্যতীত অন্য কিছুতে জিহবার ব্যবহার জাহান্নামে নিক্ষেপ হওয়ার একটি কারণ। অনুরূপ তার সদ্ব্যবহার জান্নাত লাভের একটি মাধ্যমও। বহু মানুষ জিহবার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে তার অহেতুক ব্যবহারে ভুল করে বসে।

২। মানুষের কথা ও কর্ম উভয়ের হিসাব হবে, আর শরীরের সর্বাধিক আশংকাজনক অংশ হচ্ছে জিহবা ও লজ্জাস্থান।

(১৭) <u>গীবত হারাম</u>

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ الحجرات ١٢

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করে? তোমরা নিজেরাই তো এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাক"। (৪৯ঃ ১২)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন, তোমাদের (কোন) ভাইয়ের এমন প্রসংগ আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। বলা হলো, এ ব্যাপারে আপনার কি মত যে, আমরা যা আলোচনা করি, তা যদি তার মধ্যে থেকে থাকে? তিনি বললেন, যে দোষ তোমরা বর্ণনা করো, তা যদি সত্য সত্যিই তার মধ্যে থেকে থাকে, তবেই তো গীবত করলে। যদি তার মধ্যে সে দোষ না থাকে, তাহলে তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে। (মুসলিম)

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي ﷺ: حسبك من صفية كذا وكذا (تعني أنها قصيرة)، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته.

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, সাফিয়ার ব্যাপারে এই দোষ গুলি (বেঁটে হওয়া) আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনি বললেন, তুমি এমন একটা (তিক্ত) কথা বলেছ যে, যদি তা সাগরের পানিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সমুদ্রের পানিকে তিক্ত ও পরিবর্তন করে দেবে"। (আবু দাউদ)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله.)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, মান-ইজ্জত ও ধন-সম্পদ অপর মুসলমানের জন্য হারাম ও সম্মানের যোগ্য"। (বুখারী-মুসলিম)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.)

আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে"। (তিরমিজী)

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة.)

আবু দারদা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভায়ের গীবত খন্ডন করবে, (অর্থাৎ তার তরফ থেকে প্রতিবাদ করবে) আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন"। (তিরমিজী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। পরচর্চা ও গীবত হারাম। তা কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, এবং পরচর্চাকারীর জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।
২। কোন মানুষের এমন প্রসংগে আলোচনা করা, যা সে পছন্দ করেনা, গীবতে পরিগণিত হয় এবং তা হারাম। যদিও উল্লেখিত বস্তু তার মধ্যে সত্যিকার পাওয়া যায়।
৩। গীবতকারীকে ঘৃণা করা এবং তাকে গীবত থেকে বাধা প্রদান করা অপরিহার্য। গীবত শুনাও হারাম। মুসলমানের মান-সম্মান রক্ষার মাহাত্ম্য হলো, কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা হবে।
৪। গীবত এমন কথা বা ইঙ্গিতের দ্বারাও হয়ে থাকে, যা মানুষ অপছন্দ করে।

(১৮) সত্যবাদিতার মাহাত্ম্য ও মিথ্যাবাদিতার নিন্দাবাদ

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ النحل ١٠٥

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "মিথ্যা তো সে লোকেরা রচনা করেছে, যারা আল্লাহর আয়াতকে মানেনা। তারাই প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদী"। (১৬: ১০৫)

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ التوبة ١١٩

তিনি আরো বলেন, "হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর, এবং সত্যবাদীর সঙ্গে থাক"। (৯: ১১৯)

وقال سبحانه: ﴿فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ محمد ٢١

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "যদি তারা আল্লাহর নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির সত্যতা প্রমাণ করতো, তাহলে তাদের ভাল হতো। (৪৭:২১)

وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ، قال: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة.)

হাসান ইবনে আলী (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "তোমার কাছে যা হালাল তথা বৈধ হওয়াতে সন্দেহ জাগে, তা বর্জন করে এমন জিনিস গ্রহণ কর, যাতে সন্দেহ নাই। নিঃসন্দেহে সত্যবাদিতার (ফল)প্রশান্তি এবং মিথ্যাবাদিতার (পরিণতি) সন্দেহ"। (তিরমিজী-নাসায়ী)

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "সত্য-বাদিতা কল্যাণের পথ দেখায় আর কল্যাণ মানুষকে জান্নাতের পথে নিয়ে যায়। কোন মানুষ সত্য কথা বলতে থাকলে আল্লাহ তাকে সত্যবাদীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আর মিথ্যা কথা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায় আর পাপ জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়। কোন মানুষ মিথ্যা কথা বলতে থাকলে আল্লাহ তাকে মিথ্যাবাদীদের তালিকাভুক্ত করেন"। (বুখারী-মুসলিম)

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر) متفق عليه

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যার মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে, সে পাকা মুনাফিক। আর যার মধ্যে উহার কোন একটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে আর যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করবে, ততক্ষণ তার মধ্যে মুনাফেকীর এক খাসলাত বা বৈশিষ্ট্য আছে বলা হবে। আর তা হলো,আমানতের খিয়ানত করা, কথায় কথায় মিথ্যা বলা, ওয়াদাচুক্তি ভঙ্গ করা এবং ঝগড়ার সময় অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করা"। (বুখারী-মুসলিম)

<u>উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী</u>

১। মিথ্যা বলার ব্যাপারে ভয়-ভীতি প্রদর্শিত হয়েছে।আর তা মুনাফেকদের বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং সে সম্পর্কে কঠোর আযাবের কথাও ব্যক্ত হয়েছে।

২। মিথ্যা পাপের দিকে নিয়ে যায় ও তা জাহান্নামে প্রবেশের কারনসমূহের একটি কারণও বটে।

৩। সত্যবাদিতার মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বিষয়ে সত্যের প্রতি উৎসাহিতও করা হয়েছে।

৪। মিথ্যা মুনাফেকীর খাসলাত বা বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি বৈশিষ্ট্য।

(১৯) তাওবা

قال الله تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ النور ٣١

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "হে মুমেন লোকেরা! তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর, আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে"। (২৪:৩১)

وقال : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً.﴾ التحريم ٨.

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহর নিকট তাওবা কর, খাঁটি ও সত্যিকার তাওবা' (৬৬:৮)

عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (يأيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مائة مرة.) مسلم

আগার বিন এসার মুযানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হে মানব মন্ডলী! আল্লাহর নিকট তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা কর, কারণ আমি দিনে এক শত বার তাওবা করি"। (মুসলিম)

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة .)

আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবায় সেই ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন, যে বান্দার উট মরু প্রান্তে নিখোঁজ হওয়ার পর পুনরায় সে তা লাভ করে"। (বুখারী-মুসলিম)

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "প্রত্যেক আদম সন্তান দ্বারা ত্রুটি হয়ে থাকে, তবে সর্বোত্তম ত্রুটিকারী তো সেই, যে ত্রুটির পর ক্ষমা প্রার্থনা করে' (তিরমিজী)

وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: (إن الله عز وجل يقبل توبة العبد مالم يغرغر)

আব্দুল্লাহ বিন উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বান্দার তাওবা গ্রহণ করে থাকেন"। (অর্থাৎ, তার প্রাণ কন্ঠনালীতে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত)

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.)

আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা দিনে ভুল-ত্রুটিকারীর তাওবাকে গ্রহণ করার জন্য রাত্রে তাঁর হস্তকে প্রসারিত করে দেন। আল্লাহ রাত্রে ভুল-ত্রুটিকারীর তাওবাকে গ্রহণ করার জন্য দিনে তাঁর হস্তকে প্রসারিত করে দেন। আর পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত এটা অব্যাহত থাকবে"। (মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ছোট-বড় প্রত্যেক গুনাহ থেকে সব সময় তাওবা করা অপরিহার্য। কারণ তাওবাই বান্দার সাফল্য ও মুক্তির উপকরণ।

২। আল্লাহর নিকট তাওবার এত মর্যাদা যে, তাঁর রহমত এতে বিস্তৃতি লাভ করে এবং তাওবা করলে তিনি আনন্দিত হন।

৩। আদম সন্তান দ্বারা ভুল-ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক, তবে তাকে তাওবা করতে হবে এবং গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

তাওবার শর্তাবলী এবং উহার কতিপয় বিধান

১। তাওবার সর্ব প্রথম শর্ত হলো, মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পূর্বে ও আত্মা কন্ঠনালীতে পৌঁছবার পূর্বে করতে হবে।

২। দ্বিতীয় শর্ত হলো, পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে করতে হবে, কারণ পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হওয়ার পর তওবা কোন কাজে আসবে না।

৩। যদি কোন ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে তাওবা করা সত্ত্বেও পুনরায় উক্ত পাপ করে বসে, তাহলে তার প্রথম তাওবা গ্রহণ হবে কিন্তু পরে কৃত পাপের জন্য পুনরায় তাকে তাওবা করতে হবে।

৪। পাপ পরিত্যাগ করা এবং কৃত পাপের দরুন অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে উক্ত পাপ না করার জন্য দৃঢ় পরিকল্পনা করা।

(২০) সালাম করা

قال الله تعالى:﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَتَدْخُلُوا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ النور٢٧

মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ কর না, যতক্ষণ না তার বাসিন্দাদের থেকে অনুমতি নাও এবং তাদের সালাম কর"। (২৪ঃ ২৮)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর পরস্পরকে না ভালবাসা পর্যন্ত তোমাদের ঈমান পূর্ণতা লাভ করবে না। আমি কি এমন কাজের কথা বলবো না, যা করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে? সে কাজটি হচ্ছে, তোমরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপক হারে সালামের প্রচলন সৃষ্টি কর।"। (মুসলিম)

وعن عبد الله بن سلام قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول : (ياأيها الناس: أفشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام.)

আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, হে মানব সম্প্রদায়! (পরস্পরের মধ্যে) ব্যাপক হারে সালামের প্রচলন সৃষ্টি কর। (অভুক্তদের) আহার করাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ এবং যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে সেই সময় নামাজ পড়। তাহলে শান্তিতে ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে"। (তিরমিজী)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة.)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কোন মজলিসে এলে, সে যেন সালাম করে। অতঃপর সে যদি চায় বসবে আর যদি উঠে যেতে চায়, তখনও সালাম করবে, কারণ প্রথম সালামটির তুলনায় দ্বিতীয় ও শেষ সালামটির অধিকার কম নয়"। (আবু দাউদ)

মাসায়েল

১। সালাম করার মাহাত্ম্য হলো, এটা পরস্পর ভালবাসা সৃষ্টির অন্যতম কারণ যা জান্নাতে প্রবেশের পথকে সুগম করে দেয়।
২। পরিচিত ও অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম করা মুস্তাহাব। সালাম শুধু পরিচিতি সাপেক্ষ নয়।
৩। মাসনূন সালামের শব্দ হলো, "আসসালামো আলাইকুম" যদি "অরাহমাতুল্লাহ" এবং "অবারাকাতুহু" সংযুক্ত করে, তাহলে উত্তম। সালামের উত্তর প্রদানের বেলায় নিয়ম অনুরূপ।
৪। কাফেরকে প্রথমে সালাম দেওয়া হারাম। হাঁ, কাফের সালাম করলে, শুধু "ওয়া আলাইকুম "বলবে।
৫। একই মজলিসে কাফের ও মুসলমান উভয় ধরণের লোক থাকলে সালাম করা জায়েয।
৬। দু'মুসলমান ক্ষনিকের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পুনরায় মিলিত হলে সালাম করা মুস্তাহাব।
৭। কারো বাড়ীতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা নিষেধ।

(২১) আহারের আদব

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في الأول فليقل في الآخر [حين يذكر] : بسم الله في أوله وآخره.)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন আহারে বসবে, তখন সে যেন "বিসমিল্লাহ"বলে নেয়। প্রথমে বলতে ভুলে গেলে বলবে "বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু"। (তিরমিজী)

وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: (سم الله و كل بيمينك و كل مما يليك.)

উমার ইবনে আবি সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাকে বললেন "বিসমিল্লাহ' বলে খেতে আরম্ভ করবে। আর ডান হাত দিয়ে নিজের দিক থেকে খাবে"। (বুখারী-মুসলিম)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها.)

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যেন বাম হাতে পানাহার না করে, কারণ শয়তান বাম হাতে পানাহার করে"।(মুসলিম)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (ما عاب رسول الله ﷺ طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন দিন কোন খাবারের দোষ বর্ণনা করেননি। রুচি সম্মত হলে আহার করেছেন, অন্যথায় বর্জন করেছেন। (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। 'বিসমিল্লাহ' বলে পানাহার আরম্ভ করা মুস্তাহাব। যদি কোন ব্যক্তি প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে যায়, তাহলে খাওয়াকালীন যখনই স্মরণ হবে পড়ে নেবে।

২। বাম হাতে খাওয়া নিষেধ। এতে শয়তানের সহিত সাদৃশ্যভাব প্রকাশ পায়। তবে কোন ব্যক্তি ডান হাতে খেতে অক্ষম হলে, সে বাম হাতে খেতে পারে।

৩। খাওয়ার সুন্নাত হলো, কোন খাবারের দোষ বর্ণনা না করা। রুচি সম্মত হলে আহার করবে, অন্যথায় বর্জন করবে। তবে কাউকে দোষ সম্পর্কে জ্ঞাত করাতে চাইলে করতে পারে।

(২২) প্রস্রাব ও পায়খানার আদব

عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ إذا دخل (أي إذ أراد دخول) الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث (الشر) والخبائث (الشياطين).

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রস্রাবখানা ও পায়খানায় প্রবেশ করার ইচ্ছা করতেন, তখন বলতেন,

((اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث))

(আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিনাল খুবুসি অল খাবায়িসি) হে আল্লাহ! আমি খবিস জিন ও জিন্নী থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি"। (বুখারী-মুসলিম)

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة.

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রস্রাবখানা ও পায়খানা থেকে বের হতেন, তখন বলতেন, (غفرانك) (গুফরানাকা) হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি"। (আবু দাউদ, তিরমিজী)

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ نهى أن يُبال في الماء الراكد.

জাবির বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্থির বা বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন"। (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মুস্তাহাব হলো, প্রস্রাব-পায়খানা যাওয়ার ইচ্ছা করলে এই দো'য়া পাঠ করা, (আয়ুযু বিল্লাহি মিনাল খুবসি অল খাবায়িসি) হে আল্লাহ! আমি খবিস জিন ও জিন্নী থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং পায়খানা থেকে বের হয়ে বলা, (গুফরানাক) হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাইছি।

২। পেশাব পায়খানা করার সময় লোক চক্ষু থেকে নিজের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা অত্যাবশ্যক এবং মানুষের চলা ফেরার স্থান থেকে দূরবর্তী স্থানে যাওয়া মুস্তাহাব। ঘরের বাহিরে পেশাব-পায়খানা করলে কেবলাকে সামনে

যা পেছনে না রাখা ভাল।

৩। পেশাব-পায়খানা থেকে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা এবং অতঃপর খুব ভাল ভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখা ওয়াজিব।

৪। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ধর্ম বিধায় মানুষের প্রতিটি বিষয়কে তুলে ধরে তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছে এমনকি পেশাব-পায়খানার আদাবসমূহকেও ছেড়ে দেয়া হয়নি।

(২৩) হাঁচি আসা ও হাই তুলা

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، فأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. أخرجه البخاري.

আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা হাঁচি ভাল বাসেন এবং হাইতুলাকে অপছন্দ করেন। অতএব যখন কোন ব্যক্তি হাঁচির পর বলে"আলহামদুলিল্লাহ"তখন শ্রবণকারী প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হলো, তার উত্তরে (يرحمك الله) (য়্যারহা মুকাল্লাহ) বলা। তবে হাই তুলা শয়তান কর্তৃক হয়ে থাকে। অতএব যখন কোন ব্যক্তির হাই আসে, সে যেন সাধ্যানুসারে তা থামানোর চেষ্টা করে, কারণ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন হাই তুলে, তখন শয়তান হাসে"। (বুখারী)

وعنه قال قال رسول الله ﷺ: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه - أو صاحبه - يرحمك الله، فإذا قال: يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري.

উক্ত সাহাবী থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তির হাঁচি আসে সে যেন বলে, (আলহামদুলিল্লাহ) আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা এবং তার ভাই ও সাথী সঙ্গীরা যেন বলে, (য়্যারহামুকাল্লাহ আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। অতঃপর সে ব্যক্তি বলবে, (য়্যাহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ্ বালাকুম) আল্লাহ তোমায় সুপথ প্রদর্শন করুন এবং তোমার সমস্যার সমাধান করুন"। (বুখারী)

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. أخرجه مسلم.

আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি হাঁচির পর "আলহামদুলিল্লাহ" বললে, তোমরা উত্তরে "য়্যারহামুকাল্লাহ" বলবে কিন্তু সে যদি "আলহামদুলিল্লাহ" না বলে, তবে তোমরা "য়্যারহামুকাল্লাহ"বলবে না"। (মুসলিম)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাঁচির সময় স্বীয় মুখমন্ডলকে হাত অথবা কাপড় দ্বারা ঢেকে নিতেন এবং শব্দকে দমন করতেন"। (আহমদ, তিরমিজী ও আবু দাউদ

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। যখন হাঁচির পর কেউ "আলহামদুলিল্লাহ" বলে, প্রত্যেক শ্রবণকারীর তার উত্তরে "য়্যারহামুকাল্লাহ" বলা মুস্তাহাব।
২। যদি হাঁচির পর 'আলহামদুলিল্লাহ' না বলে, তাহলে "য়্যারহামুকাল্লাহ" বলা যাবে না।
৩। হাইকে থামানো ও দমন করা মুস্তাহাব।
৪। হাই আসার সময় মুখের উপর হাত রাখা মুস্তাহাব।
৫। হাঁচি আসার সময় মুখমন্ডলকে হাত, কাপড় অথবা রুমাল দিয়ে ঢাকা মুস্তাহাব।
৬। হাঁচির সময় জোরে শব্দ করা অপছন্দনীয়।

(২৪) কুকুর পোষা

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط.)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি গবাদি পশুর পাহারা দেওয়া বা শিকার করা কিংবা কৃষিক্ষেতের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পুষবে, তার ভাল কাজের প্রতিদান থেকে দৈনিক এক কিরাত পরিমাণ নেকী কমে যাবে"। (বুখারী-মুসলিম)

وعنه أن رسول الله ﷺ قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب.)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "কোন কুকুর তোমাদের কারো পাত্রে তার মুখ লাগালে, সেটাকে সাতবার পানি দ্বারা ধুয়ে নাও এবং অষ্টমবারে মাটি দ্বারা মেজে নাও"। (মুসলিম)

নির্দেশনাবলী

১। শিকার, অথবা গবাদি পশু ও কৃষিক্ষেতের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য ছাড়া কুকুর পোষা হারাম।
২। কুকুর পোষার প্রতি তীব্র ঘৃণা ও নিন্দা ব্যক্ত করা হয়েছে।
৩। কুকুরের ছোঁয়া বস্তু খুবই নাপাক (অপবিত্র) বিধায় সাতবার ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তন্মধ্যে একবার মাটি দ্বারা মাজতে বলা হয়েছে।

(২৫) আল্লাহর যিকর বা স্মরণ

قال الله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.﴾ الجمعة ١٠

মহান আল্লাহ বলেন, "আর আল্লাহকে খুব বেশী স্মরণ করতে থাক। সম্ভবত তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে"। (৬২:১০)

وقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ الأحزاب ٤١

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "হে ঈমানদার লোকেরা! খোদাকে খুব বেশী করে স্মরণ কর, এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তসবীহ করতে থাক। (৩৩: ৪১- ৪২)

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: (مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت.)

আবু মুসা আশআরী (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে, আর যে তাঁকে স্মরণ করে না, তাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য জীবিত ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়"। (বুখারী-মুসলিম)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان بالميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দু'টি এমন বাক্য বা কালেমা যা পাঠ করা খুবই সহজ, নেকীর পাল্লায় অতি ভারী এবং আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়। আর তা হলো, "সুবহানাল্লাহি অ বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম" আল্লাহ পূত পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি পূত পবিত্র ও মহান"। (বুখারী-মুসলিম)

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (لأن أقول سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.)

উক্ত সাহাবী থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর চেয়ে আমার নিকট প্রিয় হলো, এই দো'য়াটি পাঠ করা "সুবহানাল্লাহি অল হামদুলিল্লাহি অ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আক-বার"। অর্থাৎ, আল্লাহ পূত পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই, তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, এবং তিনি মহান"। (মুসলিম)

وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (أفضل الذكر: لا إله إلا الله.)

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন,"সর্বোত্তম যিকর হলো "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। (তিরমিজী)

কতিপয় যিকর

১। শয়নকালে পড়ার দোআ

((باسمك اللهم أموت وأحيا))

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নাম নিয়েই শয়ন করছি, আবার তোমার নাম নিয়েই উঠবো'।

২। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দোআ

((الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور))

অর্থাৎ, 'সেই আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে মৃত্যুর পর আবার জীবিত করলেন। আর আমাদের

সকলকে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে'।

৩। যানবাহনে আরোহনের দোআ

((بسم الله الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون))

অর্থাৎ,'আমি সেই আল্লাহর নাম নিয়ে আরোহন করছি, যাঁর সমস্ত প্রশংসা। পূ ত পবিত্র সেই সত্তা যিনি আমাদের জন্য এই যানবাহনকে আনুগত্যশীল করে দিয়েছেন। আমরা তাকে আনুগত্যশীল করতে পারতাম না। আর আমাদের সকলকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।'

৪। কোন স্থানে অবতরণ করলে দোআ

((أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق))

'আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্য দ্বারা তাঁর সৃষ্টির অপকার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

৫। ওযুর আগে যা পড়তে হয়

((بسم الله))

'আমি আল্লাহর নাম নিয়ে ওযু আরম্ভ করছি'।

৬। যা ওযুর পর পড়তে হয়

((أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله))

অর্থাৎ, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন শরীক নেই। আর আমি এটাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রেরিত রাসূল এবং তাঁর বান্দা।'

৭। ঘর থেকে বের হওয়ার দোআ

((بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله))

অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁর উপর ভরসা করে বের হচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ব্যতীত আমাদের কোন কিছু করার সামর্থ নেই'।

৮। বাড়ীতে প্রবেশ করার দোআ

((بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا))

অর্থাৎ, 'আমি আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি। তাঁরই নাম নিয়ে বের হয়েছিলাম। আর আমি আমার প্রভুর উপর ভরসা করি'।

৯। রাসূলের উপর দরূদ পাঠ করার নিয়ম

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.))

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণ কর। যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল কর, যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর বরকত নাযিল করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত।

১০। প্রভাত কালে যা পড়তে হয়

((اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور))

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ আমরা তোমারই হুকুমে সকালে উপনীত হলাম এবং তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হয়। তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি এবং তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যুবরণ করবো। আর তোমার সমীপেই আমরা পুনরুত্থিত হবো'।

১১। সন্ধ্যায় যা পড়তে হয়

((اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير))

অর্থাৎ, আমরা তোমারই হুকুমে সন্ধ্যায় উপনীত হলাম এবং তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল হয়। তোমারই হুকুমে আমার জীবিত থাকি এবং তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যুবরণ করবো। আর তোমারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন'।

(২৬) বন্ধু

قال تعالى: ﴿الأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ﴾ الزخرف ٦٧

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "সেই দিনটি যখন আসবে, তখন মুত্তাকী লোকেরা ছাড়া অপর সব বন্ধুরা পরস্পরের দুশমন হয়ে যাবে"। (৪৩: ৬৭)

وقال سبحانه: ﴿ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً يَاوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيلاً لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولاً﴾ الفرقان ٢٧

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "যালেম লোকেরা নিজেদের হাত কামড়াবে ও বলবে, হায়, আমি যদি রাসূলের সঙ্গ গ্রহণ করতাম! হায় আমার দুর্ভাগ্য! অমুক ব্যক্তিকে যদি আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! তার প্ররোচনায় পড়ে আমি সেই নসিহত মেনে নেইনি যা আমার নিকট এসেছিল। মানুষের পক্ষে শয়তান বড়ই অবিশ্বাসী সাব্যস্ত হয়েছে"। (২৫:২৭-২৯)

وقال تعالى: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ، قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ، وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ.﴾

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "পরে তারা পরস্পরের দিকে মুখ ফিরিয়ে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে। তাদের একজন বলবে, দুনিয়ায় আমার একজন সাথী ছিল, যে আমাকে বলত, তুমিও কি এটা সত্য বলে স্বীকার-

কারীদের মধ্যে শামিল? আমরা যখন মরে যাব ও মাটিতে পরিণত হব এবং অস্থি জীর্ণচূর্ণ হয়ে যাবে, তখন বাস্তবিকই কি আমাদেরকে পুরস্কার ও শাস্তি দেওয়া হবে? এখন সেই লোক কোথায় আছে তা কি আপনারা দেখতে চান? এই কথা বলে যখনই সে মস্তক অবনত করবে, তখনই সে তাকে জাহান্নামে দেখতে পাবে। তাকে সে ডেকে বলবে, খোদার শপথ! তুমি তো আমাকে ধ্বংস করে দিচ্ছিলে। আমার খোদার অনুগ্রহ যদি না পেতাম তাহলে আজ আমিও সেই লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম, যারা গ্রেফতার হয়ে এসেছে"। (৩৭:৫০-৫৭)

وقال ﷺ: (الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মানুষ তার বন্ধুর স্বভাব-আচরণে প্রভাবিত হয়, সুতরাং যাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, তার ব্যাপারে আগে যেন ভেবে নাও"। (আবু দাউদ-তিরমিজী)

وقال ﷺ:(سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ... ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সাত প্রকার লোককে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ছায়ায় স্থান দেবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না--- যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর নিমিত্তে ভালবেসে একত্রিত হয়েছে এবং তাঁরই নিমিত্তে বিচ্ছিন্ন হয়েছে"। (বুখারী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। প্রত্যেক মানুষ একজন সাথী-সঙ্গীর প্রয়োজন বোধ করে, সুতরাং এমন সৎ সাথীর নির্বাচন করা দরকার যে তাকে সৎ পথ দেখাবে এবং সৎ কাজ করতে সহযোগিতা করবে।

২। কখনো কখনো বন্ধু শত্রুর থেকেও অধিক ক্ষতিকারক সাব্যস্ত হয়, যখন সে তোমাকে অন্যায় ও আল্লাহকে অস্বীকারের পথ দেখায়।

৩। কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা থেকে বেঁচে থাকা দরকার। কারণ, তারা মুসলমানদেরকে সৎ কাজ ও আল্লাহর আনুগত্যে বাধা সৃষ্টি করে।

(২৭) ধৈর্য

قال الله تعالى:﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا ....﴾ آل عمران ٢٠٠

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য অবলম্বন কর, বাতিল পন্থীদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন কর। (৩:২০০)

وقال سبحانه:﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ البقرة ١٥٥

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "আমরা নিশ্চয় ভয়, বিপদ, অনশন, জানমালের ক্ষতি এবং আমদানী হ্রাসের দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। তাদেরকে সুসংবাদ দাও, যারা এই সব অবস্থায় ধৈর্য অবলম্বন করে"। (২: ১৫৫)

وعن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال:قال رسول ﷺ: (عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له) مسلم

সুহাইব বিন সেনান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমেনদের ব্যাপা-রে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে, তাদের প্রতিটি বিষয়ই কল্যাণকর, সুখ-সমৃদ্ধির সময় তারা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, এটাও তাদের জন্য মঙ্গল। আবার বিপদ-আপদের সময় তারা ধৈর্য ধারণ করে, এটাও তাদের জন্য মঙ্গল। (মুসলিম)

وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله عز وجل يقول: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة.) البخاري

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যখন আমার কোন বান্দাকে দু'টি প্রিয় বস্তুর দ্বারা (চক্ষুদ্বয় ছিনিয়ে) পরীক্ষা করি এবং সে তাতে ধৈর্য ধারণ করে, আমি তাকে উক্ত দু'টি প্রিয় বস্তুর পরিবর্তে জান্নাত দান করব"। (বুখারী)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (ما يصيب المسلم من نصب (تعب) ولا وصب (مرض) ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ক্লান্তি, রোগব্যাধি, চিন্তা-ভাবনা, দুঃখ-কষ্ট এমন কি পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি সহ যে কোন বিপদ-আপদ মুসলমানদের উপরে আসে এসবই তাদের গুনাহের কাফফারাতে পরিণত হয়"। (বুখারী-মুসলিম)

قال: (ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وفي ولده وماله حتى يلقى الله وما عليه ﷺ وعنه أن رسول الله خطيئه.)

উক্ত সাহাবী থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মুমেন ও মুমেনাহ বান্দা বান্দীর জান-মাল ও সন্তান-সন্ততির উপর অনবরত বিপদ-আপদ আসতে থাকে, তাই তারা গোনাহ মুক্তাবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করবে"। (তিরমিজী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। প্রত্যেক ব্যাপারে ধৈর্য ধারণের প্রতি উৎসাহিত করা। কখনো অসন্তুষ্ট না হওয়া, কারণ অসন্তুষ্টি ইবতেলা ও আজমায়েশ তথা পরীক্ষার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করে দেয়।
২। বিপদ-আপদের মাধ্যমে মুসলমানদের গুনাহ ও ভুল-ত্রুটির মার্জনা হয়।
৩। আল্লাহর ইতাআত ও আনুগত্যে ধৈর্য ধারণ, পাপ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকতে ধৈর্য ধারণ, ধৈর্যের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে এ দুটি সর্বোত্তম প্রকার।
৪। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য, কারণ তিনি সর্বজ্ঞ ও মহা বৈজ্ঞানিক। তিনিই বান্দাদের ভাল-মন্দ সম্পর্কে বেশী জ্ঞাত।

أحكام اليوم الآخر

শেষ দিবস

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা মহান আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক নবীকুলের শিরোমণি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর।শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস করা ঈমানের ছয়টি মূল ভিত্তি সমূহের মধ্যে অন্যতম ভিত্তি। কোন মানুষ মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না এদিবস সম্পর্কে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াত ও বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূলের উপর ঈমান আনে। মানুষের আত্মার সংশোধন, খোদাভীতি ও আল্লাহর দ্বীনে অবিচল অনড় থাকার ক্ষেত্রে শেষ দিবসের জ্ঞান ও অধিকতর স্মরণের বিরাট প্রভাব রয়েছে। উক্ত দিনের ভয়াবহতা, আতংক ও ভীষণ পরিস্থিতির স্মরণ করা থেকে বিমুখ থাকার মত অন্য কোন জিনিস মানুষের অন্তরকে এত পাষাণ করে না, উদ্বুদ্ধ করে না তাকে পাপ করতে। আল্লাহতা'য়ালা সেদিন সম্পর্কে বলেন, 'যে দিনটি বালকদিগকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে'। (৭৩ঃ১৭) তিনি অন্যত্র বলেন, 'হে মানব জাতি, তোমাদের রবকে ভয় করো, নিঃসন্দেহে কেয়ামতের কম্পন বড় ভয়াবহ জিনিস। যেদিন তোমরা উহাকে দেখবে সেদিন অবস্থা এই হবে যে,প্রত্যেক স্তন্য দানকারিণী নিজের দুগ্ধপোষ্য সন্তান থেকে গাফেল হয়ে যাবে। গর্ভবতী নারীর গর্ভ খসে পড়বে এবং লোকদেরকে তোমরা উদভ্রান্ত দেখতে পাবে। অথচ তাঁরা নেশাগ্রস্ত হবে না, বরং আল্লাহর আযাবই এত দূর সাংঘাতিক হবে'। (২২ঃ১-২)

মৃত্যু

১। এ পৃথিবীতে প্রত্যেক জীবের শেষ পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, 'প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে'। (৩ঃ১৮৫) তিনি আরো বলেন, 'এ পৃথিবীতে সবই ধ্বংসশীল'। (৫৫ঃ২৬) তিনি নিজের নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আপনিও মৃত্যু বরণ করবেন আর তাঁরাও মরবে'। (৩৯ঃ৩০) এ বিশ্ব চরাচরে কোন মানুষের জন্য চিরস্থায়িত্ব নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'চিরন্তনতা তো তোমার পূর্বের কোন মানুষের জন্য সাব্যস্ত করে দেয় নাই'। মৃত্যু একটি নিশ্চিত বস্তু তাতে কোন সন্দেহ নেই। অথচ অধিকাংশ লোকই উহা থেকে গাফেল। একজন মুসলমানের করণীয় যে, মৃত্যুর কথা অধিক অধিক স্মরণ করবে এবং উহার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। অনুরূপভাবে দুনিয়া থাকতে সময় ফুরিয়ে যাবার পূর্বে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করবে। আল্লাহর রাসূল(সাঃ) বলেছেন, 'পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে মূল্যবান মনে করো, তোমার জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে, তোমার সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, তোমার অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে, তোমার যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে এবং তোমার সচ্ছলতা, প্রাচুর্যকে দারিদ্র্যতার পূর্বে'।(মুসনাদ আহমদ) জেনে রাখুন, মৃত ব্যক্তি পার্থিব কোন সম্পদ কবরে বয়ে নিয়ে যাবে না।থাকবে তাঁর সঙ্গে শুধুমাত্র তার আমল। সুতরাং ভাল কাজের পাথেয় সংগ্রহ করতে আগ্রহী হউন, যা আপনাকে দেবে আনন্দ এবং আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি ও পরিত্রান।

২। মানুষের জীবনের সময় সীমা এমন একটি রহস্য ও গোপন বস্তু, যা একমাত্র মহান আল্লাহ জানেন, অন্য কেউ নয়। কেউ জানে না কোথায় মরবে এবং কখন মরবে।কারণ, সেটা গায়েবের ইলম্ তথা অদৃশ্য জগতের জ্ঞান, যা এক ও একক মহান আল্লাহই জানেন।

৩। মৃত্যু এলে তা দমন, প্রতিহত করা বা পিছিয়ে দেয়া কিংবা তা থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ পাক বলেন, 'প্রত্যেক জাতির অবকাশের নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। তাদের সেই মেয়াদ যখন পূর্ণ হয়ে আসে, তখন এক নিমিষেরও আগে কি পরে হয় না'। (৭ঃ৩৪)

৪। মুমিনের নিকট যখন মৃত্যু আসে, তখন মৃত্যুর ফেরেশতা সুন্দর মনোহর রূপ ও আকৃতি নিয়ে উপস্থিত হয়। সুগন্ধে ভরে যায় পরিবেশ।আর তাঁর সঙ্গে থাকে রহমতের ফেরেশতা, যারা উক্ত ব্যক্তিকে জান্নাতের

সুসংবাদ দেয়। আল্লাহ পাক বলেন,'যে সব লোক বলল, আল্লাহ আমাদের রব ও মালিক এবং তাঁরা এর উপর সুদৃঢ় ও অটল থাকল,নিঃসন্দেহে তাদের জন্য ফেরেশতা অবতরণ করে বলেন, ভয় পেয়োনা, চিন্তা করো না আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হও তোমাদের নিকট যার অঙ্গীকার করা হয়েছে'।৪১ঃ৩০
কাফেরের কাছে মৃত্যুর ফেরেশতা দুর্গন্ধময় কাপড়,কালো চেহারা ও ভীতিপ্রদ আকৃতি ধারণ করে আসেন এবং তাঁর সাথে থাকে আযাবের ফেরেশতা যারা তাঁকে আযাবের দুঃসংবাদ দেয়।আল্লাহতা'য়ালা বলেন,'হায়, তুমি যদি যালিমদেরকে মৃত্যুর যাতনায় হাবুডুবু খাওয়া অবস্থায় দেখতে এবং ফেরেশতারা হাত প্রসারিত করে বলতে থাকে, দাও, বের কর তোমার জান-প্রাণ; আজ তোমাদেরকে সে সব অপরাধের কারণে লাঞ্ছনার শাস্তি দেয়া হবে,খোদার উপর মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে যা অকারণ প্রলাপ বকতেছিলে এবং তাঁর আয়াতের মুকাবিলায় অহংকার বিদ্রোহ প্রদর্শন করতে ছিলে' (৬ঃ৯৩)।

মৃত্যু এলে বাস্তব সত্য উম্মোচিত হয়ে যাবে এবং আসল তত্ত্ব মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'এমন কি যখন তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু এসে হাজির হয়, তখন বলতে শুরু করে, হে আমার রব! আমাকে পুনরায় ফিরিয়ে পাঠান সে দুনিয়ায় যা আমি পেছনে ফেলে এসেছি। আশা আছে আমি ভাল কাজ করবো। কখনো নয় এটা একটি কথা মাত্র যা সে বলতেছে। এখন এসব মৃত্যু ব্যক্তি ও দুনিয়ার মধ্যে একটি অন্তরায় আছে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত' (২৩ঃ৯৯-১০০)।

মৃত্যু এলে কাফের ও পাপী লোক ভাল ও সৎ কাজ করার জন্য পুনরায় পার্থিব জীবনের দিকেফিরে যেতে চাইবে কিন্তু সময় শেষ হওয়ার পর অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'তুমি দেখতে পাবে এসব যালিম লোকেরা যখন আযাব দেখবে তখন বলবে,এখন ফিরে যাবার কোন পথ কি আছে'? (৪২ঃ৪৪)।

৫। বান্দাগণের উপর আল্লাহর অশেষ করুণা ও রহমত যে,যার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে শেষ বাক্য "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" হবে, সে জান্নাত লাভ করবে।রাসুল (সাঃ)বলেছেন, 'দুনিয়ায় যার শেষ বাক্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ হবে, সে জান্নাত লাভ করবে'। কারণ এমনি মুমূর্ষ অবস্থা ও সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে কালেমার ব্যাপারে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে তা উচ্চারণ করা সম্ভব হবে না। পক্ষান্তরে নিষ্ঠাহীন ব্যক্তি মৃত্যুর যাতনায় তা ভুলে যাবে। একারণেই মৃত্যু ঘনিয়ে আসা ব্যক্তিকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর" শিক্ষা দেয়া সুন্নত।

কবর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যখন বান্দাকে কবরে দাফন করা হয় এবং তাঁর সঙ্গী সাথীরা ফিরে যায় আর সে তাদের জুতোর শব্দ শুনতে পায়,এমতাবস্থায় দু'জন ফেরেশতা এসে বসে যায় এবং তাকে বলে, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বল? রাসূল (সাঃ)বলেন, 'সে যদি মুমিন হয় বলবে,আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল'। রাসূল(সাঃ) বলেন, 'তখন তাকে বলা হবে, দেখ! দোযখে তোমার স্থান, আল্লাহ তার পরিবর্তে বেহেশতের একটি আসন দান করেছেন'। রাসূল (সাঃ) বলেন, সে উভয় আসন অবলোকন করবে'। কাফের বা মুনাফেককে বলা হবে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বল? সে বলবে, আমি জানি না, মানুষ যাই বলত, আমি তাই বলতাম।অতঃপর তাকে বলা হবে, না তোমার জ্ঞান ছিল; না যাদের জ্ঞান ছিল তাদের অনুসরণ করেছিলে। লোহার হাতুড়ি দ্বারা এমন এক প্রচন্ড আঘাত করা হবে, যার ফলে সে এমন চিৎকার করবে, যা মানুষ ও জ্বীন ছাড়া কবরের পার্শ্বস্থ সব কিছু শুনতে পাবে'।(নাসায়ী)

কবরে মানুষের দেহে প্রাণ ফিরে আসার বিষয়টি আখেরাত সংশ্লিষ্ট বিষয় হেতু মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এ পৃথিবীতে তা অনুধাবন করতে পারে না। মুসলমানদের ঐকমত্য বিশ্বাস যে,মানুষ প্রকৃত মুমিন ও অফুরন্ত সুখের যোগ্য হলে সে কবরে আরাম উপভোগ করবে অথবা শাস্তির যোগ্য হলে সে শাস্তি পাবে। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, 'দোযখের আগুন উহার উপর সকাল ও সন্ধ্যা তাদেরকে পেশ করা হয়।আর যখন

কেয়ামতের মুহূর্ত আসবে তখন নির্দেশ হবে যে, ফেরাউনের দল-বলকে কঠিনতর আযাবে নিক্ষেপ করো।' (৪০:৪৬)।

আল্লহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, 'কবরের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও'। (আবু দাউদ) সুস্থ-বিবেকও তা অস্বীকার করে না। কারণ,মানুষ এ পার্থিব জীবনে উহার সাদৃশ্য বা কাছাকাছি বস্তু দেখে। ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে অনুভব করছে যে, তাকে কঠিনতর শাস্তি দেয়া হচ্ছে আর সে চীৎকার করে এবং অন্যের সহযোগিতা কামনা করে, কিন্তু তাঁর পাশের ব্যক্তি কিছুই এ সম্পর্কে অনুভব করে না। অথচ জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে বিরাট তফাৎ রয়েছে।

কবরে শাস্তি দেহ ও প্রাণ (আত্মা) উভয়ের উপর হবে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'কবর হচ্ছে আখেরাতের প্রথম মাঞ্জিল, যে উহা থেকে মুক্তি পাবে, পরবর্তীতে আরো সহজে মুক্তি পাবে। আর যে কবর থেকে মুক্তি পায়নি পরবর্তীতে আরো কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হবে'। (তিরমিজী) মুসলমানদের উচিত যে, সে যেন কবরের আযাব থেকে বিশেষ করে নামাজের সালাম ফেরার পূর্বে আশ্রয় চায়, অনুরূপ ভাবে পাপ থেকে দূরে থাকা যা কবরের আযাব ও দোজখের আগুন ভোগ করার প্রধান কারণ।

"কবরের আযাব" বলা হয়, কারন অধিকাংশ মানুষকে কবরে দাফন করা হয়। পানিতে ডুবেগেলে বা আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলে কিম্বা হিংস্র পশু খেয়ে ফেললেও আযাব বা আরাম ভোগ করবে। কবরের আযাব বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন লোহা বা অন্য কিছুর হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করা, অন্ধকার দিয়ে কবর পূর্ণ করে দেয়া, আগুনের বিছানা বিছিয়ে দেয়া, দোযখের দিকে দরজা খুলে দেয়া, তার খারাপ ও পাপ কাজসমূহ একজন কুশ্রী দুর্গন্ধময় কাপড় পরিহিত ব্যক্তির রূপ ধারণ করা ইত্যাদি। মুনাফিক বা কাফের হলে আযাব অব্যাহত থাকবে। পাপীমুমিনের পাপ অনুসারে আযাব বিভিন্ন প্রকার হবে আর সে আযাব নির্দিষ্ট সময়ের পর বন্ধ হয়ে যেতে পারে। পক্ষান্তরে মুমিন কবরে আরাম ও পরম সুখ উপভোগ করবে। কবর তাঁর জন্য প্রশস্ত করে দেয়া হবে, আলো দ্বারা তাঁর কবর সমুজ্জ্বল করা হবে, বেহেশতের দিকে দরজা খুলে দেয়া হবে, যা দিয়ে আসবে বেহেশতের সুঘ্রাণ, বেহেশতের বিছানা বিছিয়ে দেয়া হবে এবং তাঁর সৎকাজসমূহ এমন সুদর্শন ব্যক্তির রূপ ধারণ করবে যার সংস্পর্শে সে পাবে স্বস্তি ও সন্তুষ্টি।

কেয়ামত ও উহার কিছু নিদর্শন

১। আল্লাহ পাক এ বিশ্বকে চিরস্থায়িত্বের জন্য সৃষ্টি করেননি। বরং এমন এক দিন আসবে এ দুনিয়া নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আর সেদিনটাই হবে কেয়ামত দিবস। এটা একটি ধ্রুব সত্য যাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'নিশ্চয় কেয়ামত আসবে তাতে কোন সন্দেহ নাই'। (গাফির ৫৯) তিনি আরো বলেন, 'কাফেররা বলে, কেয়ামত আমাদের কাছে আসবে না। তুমি বলে দাও, আমার রবের শপথ!কেয়ামত তোমাদের নিকট অবশ্যই আসবে'। (সাবা ৩)

কেয়ামত নিকটবর্তী একটি সত্য। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'কেয়ামতের মহূর্ত নিকটবর্তী হয়েছে' (৫৪:১)। আল্লাহ পাক আরো বলেন, 'অতি নিকটে এসেগেছে লোকদের হিসাব-নিকাশের মুহূর্ত অথচ তাঁরা এখনো গাফলাতের মধ্যে বিমুখ হয়ে পড়ে আছে'।(২১:১) কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়াটা মানুষের অনুমানের মাপকাঠিতে নয়, তাদের জ্ঞান ও জানা-শুনার আলোকে নয়। বরং সেটা আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং দুনিয়ার গত হওয়া সময় হিসাবে খুবই নিকটবর্তী বলা হয়েছে। কেয়ামতের মহূর্তটির জ্ঞান গায়েবের ইলম যা একমাত্র আল্লাহই জানেন। সৃষ্টির কাউকে তিনি এবিষয়ে অবগত করেন নি। আল্লাহতা'য়ালা বলেন,' লোকেরা তোমায় জিজ্ঞাসা করে যে,কেয়ামত কখন আসবে? বল,উহার জ্ঞান আল্লাহর নিকট রয়েছে;তুমি কি করে জানবে।সম্ভবত তা খুব নিকটে উপস্থিত হয়ে গেছে।' (৩৩:৬৩)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু নিদর্শনের বর্ণনা দিয়েছেন যা কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়া প্রমাণ করবে।তন্মধ্যে অন্যতম একটি নিদর্শন হচ্ছে দাজ্জালের

আবির্ভাব। সে মানুষের জন্য এক মহা ফেতনা, বিপর্যয় ও পরীক্ষা। আল্লাহ পাক তাকে অলৌকিক কতিপয় বস্তু সম্পাদন করার ক্ষমতা দেবেন। ফলে, অনেক মানুষ ধোকার ধুম্রজালে আটকা পড়বে। সে আকাশকে নির্দেশ দিলে বৃষ্টি বর্ষণ করবে, ঘাসকে নির্দেশ দিলে উৎপন্ন হবে,এবং মৃত্যু ব্যক্তিকে জীবিত করতে পারবে, আরো অনেক কিছু। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এ ও উল্লেখ করেছেন যে,সে কানা হবে,দোযখ ও বেহেশতের দৃশ্য ও নমুনা নিয়ে আসবে। সে যেটাকে বেহেশত বলবে সেটা হবে দোযখ এবং যেটাকে দোযখ বলবে সেটা হবে বেহেশ। এ পৃথিবীতে সে চল্লিশ দিন বাস করবে। প্রথম একদিন এক বছরের সমান, আরেক দিন এক মাসের সমান, আরেক দিন এক সপ্তাহের সমান, এবং অবশিষ্ট দিনগুলি স্বাভাবিক দিনের মত হবে। মক্কা ও মদীনা ছাড়া পৃথিবীর কোন স্থান অবশিষ্ট থাকবেনা যেখানে সে প্রবেশ করবে না।

কেয়ামতের অন্যতম আর একটি নিদর্শন হচ্ছে পূর্ব দামেস্কের একটি সাদা মিনারায় ফজরের নামাযের সময় ঈসা বিন মরিয়াম (আঃ) এর অবতরণ। তিনি লোকদের সাথে ফজরের নামাজ আদায় করবেন। অতঃপর দাজ্জালকে খুঁজবেন এবং হত্যা করবেন। কেয়ামতের আরেক নিদর্শন হচ্ছে পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়।মানুষ যখন তা দেখবে তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঈমান আনা আরম্ভ করবে কিন্তু সে ঈমান আর কোন কাজে আসবে না। এতদ্ব্যতীত আরো অনেক কেয়ামতের নিদর্শন রয়েছে।

২। সর্বাপেক্ষা দুষ্ট ও অসৎ লোকের উপর কেয়ামত কায়েম হবে। কারণ, আল্লাহ পাক ইতিপূর্বে সুঘ্রাণময় বাতাস প্রেরণ করবেন যা মুমিনদের প্রাণ কবজ করে নেবে। মহান আল্লাহ যখন সমস্ত সৃষ্টিজগতের নিশ্চিহ্ন করার ইচ্ছা করবেন, তখন ফেরেশতাকে সিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার নির্দেশ দেবেন। মানুষ তা শুনা মাত্র অজ্ঞান হয়ে যাবে। আল্লাহতা'য়ালা ইরশাদ করেন, 'আর সে দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে।আর যারা আকাশ মন্ডল ও যমিনে আছে সবাই মরে যাবে। সেই লোকদের ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ জীবন্ত রাখতে চাহেন' (৩৯:৬৮)। আর সে দিনটি হবে শুক্রবার।অতঃপর ফেরেশতাকুল মৃত্যু বরন করবেন।মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বেঁচে থাকবে না।

৩। মানুষের দেহ কবরে ক্ষয় হয়ে যায়। পিঠের নিম্নভাগের হাড়ের মূলাংশ ব্যতীত মাটি সারা দেহ খেয়ে ফেলবে। আম্বিয়ায়ে কেরাম ও শহীদদের দেহ মাটি খেতে পারবে না। আল্লাহ পাক আকাশ হতে বৃষ্টিপাত করে দেহ গুলোকে সজীব সতেজ করবেন। যখন তিনি মানুষের পুনরুত্থান ও পুনরুজ্জীবনের ইচ্ছে করবেন তখন শিংগায় ফুঁক দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা ইসরাফিলকে জীবিত করে শিংগায় দ্বিতীয় বার ফুঁক দেয়ার নির্দেশ দেবেন। অতঃপর তিনি সৃষ্টিকুলকে জীবিত করবেন এবং মানুষকে তাদের কবর থেকে প্রথমবার সৃষ্টি করার ন্যায় জুতাবিহীন, উলঙ্গদেহ ও খাতনাবিহীন অবস্থায় বের করবেন। আল্লাহতা'য়ালা বলেন, 'পরে এক শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। আর সহসা তাঁরা নিজেদের রবের সমীপে উপস্থিত হওয়ার জন্য কবরসমূহ হতে বের হয়ে পড়বে' (৩৬:৫১)। আল্লাহতা'য়ালা আরো বলেন, 'তাঁরা নিজেদের কবর হতে বের হয়ে এমন ভাবে দৌড়াতে শুরু করবে, যেন নিজেদের দেবতাদের স্থানসমূহের দিকে দৌড়াচ্ছে। তাদের দৃষ্টি হবে অবনত, অপমান লাঞ্ছনা তাদের উপর সমাচ্ছন্ন থাকবে, এদিনের অঙ্গীকার তাদের সাথে করা হয়ে ছিল।' (৭০:৪৩-৪৪)

কবর হতে সর্ব প্রথম যিনি বের হবেন, তিনি হচ্ছেন আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অতঃপর মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। হাশরের ময়দান এক বিরাট প্রশস্ত বিস্তৃত স্থান। কাফেরদের হাশর হবে তাদের মুখের উপর অর্থাৎ চেহারা দিয়ে চলবে, পা দিয়ে নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কি ভাবে তাদের মুখমন্ডল দিয়ে হাশর হবে? তিনি বলেছেন, যে মহান সত্তা তাদেরকে পা দ্বারা চলাতে পারেন তিনি তাদেরকে মুখ দিয়ে চলাতেও সক্ষম। আল্লাহর যিকর হতে বিমুখ ব্যক্তির হাশর হবে অন্ধাবস্থায়। সূর্য মানুষের অতি নিকটে আসবে, মানুষ নিজেদের আমল অনুসারে ঘামে আচ্ছন্ন থাকবে, কেউবা দু গোড়ালী পর্যন্ত, আর কেউ কোমর পর্যন্ত আর কেউ ঘামে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত থাকবে। কিন্তু সেদিন আল্লাহ নিজের ছায়ার অনুরূপ প্রকার লোকদেরকে স্থান দেবেন

যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, সাত প্রকার লোককে আল্লাহ নিজের ছায়ায় স্থান দেবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না (১) ন্যায় পরায়ণ শাসক, (২) যে যুবক আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে বড় হলো, (৩) যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সঙ্গে ঝুলে থাকে, (৪) যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর নিমিত্ত ভালবেসে একত্রিত হয়েছে এবং তাঁরই নিমিত্ত বিচ্ছিন্ন হয়েছে, (৫) সে ব্যক্তি যাকে এক সম্ভ্রান্ত ও সুন্দরী মহিলা (ব্যভিচারের জন্য) আহ্বান করলে সে বলল, আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৬) সে ব্যক্তি যে এত গোপনীয়তা রক্ষা করে দান করে যে, তাঁর বামহাত জানে না যে, তাঁর ডানহাত কি খরচ করেছে, (৭) আর সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে নিভৃত নির্জন স্থানে স্মরণ করে এবং তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু বের হয়'। মুসলিম

এটা পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং মহিলাদেরকেও কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। যদি ভাল হয় তো ভাল প্রতিদান পাবে আর মন্দ হলে মন্দ ফলাফল ভোগ করবে। পুরুষের প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশ যেমন,তেমনি মহিলারও।এতে কোন ধরণের বৈষম্য নেই। মানুষের চরম পিপাসা লাগবে। এবং সে দিনটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। কিন্তু এ দীর্ঘ সময় মুমিনদের কাছে এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায়ের মত দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাবে।

মুসলমানগণ রাসূলের "হাওযে কাওসারে" আসবে এবং পান করবে। হাওয, আল্লাহর এক বিশেষ দান যা তিনি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছেন। কেয়ামতের দিবসে তাঁর উম্মাত এর পানি পান করবে। উক্ত হাওযের পানি দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্টি, মিস্কের চেয়েও সুগন্ধময় এবং বাসন-পাত্র আকাশের নক্ষত্রের সমান। যে একবার পান করবে সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না।

মানুষ হাশরের মাঠে এক সুদীর্ঘ কাল বিচার ফয়সালা ও হিসাব-নিকাশের অপেক্ষা করবে। সূর্যের প্রচন্ড তাপে ও কঠিন পরিস্থিতিতে যখন অপেক্ষা ও দাঁড়িয়ে থাকার কাল দীর্ঘ হয়ে যাবে, তখন বিচার শুরু করার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে লোক খুঁজবে। অতঃপর তাঁরা আদমের (আঃ) কাছে আসবে। তিনি অপারগতা প্রকাশ করবেন। অনুরূপভাবে হযরত নূহ (আঃ), ইবরাহিম (আঃ), মুসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) একের পর এক অক্ষমতা ও অপারগতা পেশ করবেন। অবশেষে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নিকট এলে, তিনি বলবেন, আমি এ জন্য প্রস্তুত আছি।তিনি আরশের নিচে সেজদাবনত হয়ে আল্লাহর এমন কিছু প্রশংসার বাক্য দিয়ে প্রশংসা করবেন যা সেদিন আল্লাহ তাকে শিখিয়ে দেবেন। অতঃপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! তোমার শির তুল এবং প্রার্থনা কর, তোমার প্রার্থনা গৃহীত হবে এবং সুপারিশ কর, কবুল করা হবে। আল্লাহতা'য়ালা ফয়সালা ও হিসাব শুরু হওয়ার অনুমতি প্রদান করবেন। উম্মাতে মুহাম্মদীয়ার হিসাব প্রথমেই শুরু হবে।

সর্ব প্রথম বান্দার নামায সম্পর্কে হিসাব নিকাশ শুরু হবে,যদি তাঁর নামায বিশুদ্ধ ও গৃহীত হয়, অবশিষ্ট অন্যান্য আমলের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হবে। অন্যথায় তাঁর সমস্ত আমল প্রত্যাখ্যাত হবে। অতঃপর বান্দাকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে (১) তার জীবন কোথায় অতিবাহিত করল, (২) যৌবন কাল কোথায় ব্যয় করল; (৩) ধন-সম্পদ কি ভাবে উপার্জন করল; (৪) এবং কোথায় ব্যয় করল; (৫)এবং তার ইলম অনুসারে আমল কি করল।সেদিন রক্তপাত সম্পর্কে প্রথমে ফয়সালা শুরু হবে। বিনিময় দান ও প্রতিশোধ নেয়া সেদিন ভাল-মন্দ উভয় কর্ম দ্বারা সম্পন্ন হবে। ফলে, এক ব্যক্তির ভাল কাজগুলো তার প্রতিপক্ষকে দেয়া হবে।যদি পুণ্যময় কাজ শেষ হয়ে যায়, প্রতিপক্ষের গুনাহের কাজগুলো উক্ত ব্যক্তিকে দেয়া হবে।

পুলসেরাত স্থাপন করা হবে। আর উহা চুলের চেয়ে সুক্ষ্ম, তরবারির চেয়ে ধারালো পুল, যা জাহান্নামের পৃষ্ঠে স্থাপন করা হবে। মানুষ নিজের আমল অনুসারে এ পুল পাড়ি দেবে।কেউ চোখের পলকের গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ দ্রুত ঘোড়ার গতিতে, এ পুল অতিক্রম করবে। আবার কেউ কেউ দু'হাঁটুর উপর অতিক্রম করবে। উক্ত পুলের উপর কিছু সাঁড়াশী থাকবে যা মানুষকে ধরে দোযখে নিক্ষেপ করবে।কাফের ও গুনাহগার মুমিনগণ (যাদের জন্য আল্লাহ দোযখের ফয়সালা দেবেন) পুল হতে দোযখে পড়ে যাবে। কাফেররা

তো চিরতরে দোযখে থাকবে, তবে পাপীরা আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাত লাভ করবে। আল্লাহ্ পাক নবী, রাসূল ও সৎলোকদের মধ্যে যাদের জন্য মর্জি হবে সুপারিশের অনুমতি প্রদান করবেন যেন তাঁরা দোযখে নিক্ষিপ্ত মুমিনদের জন্য সুপারিশ করে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন।

জান্নাতবাসী পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় দোযখ ও বেহেশতের মধ্যবর্তী এক স্থানে থেমে যাবে যেন পরস্পর বিনিময় ও প্রতিশোধ নিয়ে ফেলে। ফলে এমন কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার কাছে অপর ভাইয়ের হক রয়ে গেছে যতক্ষণ না সে এর বিনিময় নিয়ে নেয় এবং একজন অপর জনের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায়। যখন জান্নাতবাসী জান্নাতে এবং দোযখীরা দোযখে প্রবেশ করবে তখন মৃত্যুকে এক ভেড়ার আকৃতিতে পেশ করে তাদের (উভয় দলের) দৃষ্টির সামনে যবেহ করা হবে। অতঃপর বেহেশতবাসীকে বলা হবে, চিরস্থায়ী হও এর পর কোন মৃত্যু নেই; হে দোযখবাসী! তোমাদের জন্য চিরন্তনতা, এর পর কোন মৃত্যু নাই। কেউ যদি আনন্দ ও উল্লাসের কারণে মৃত্যু বরণ করত, বেহেশতবাসীরা মৃত্যু বরণ করত। আর যদি কেউ দুঃখ ও চিন্তায় মরে যেত, দোযখীরা মৃত্যু বরণ করত।

জাহান্নাম ও উহার আযাব

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, 'সেই দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য'। (২ঃ২৪) রাসূল (সঃ) স্বীয় সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমাদের এ আগুন দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। তাঁরা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদিও এটা যথেষ্ট ছিল। তিনি বলেন, উত্তাপ ও গরমে ৬৯গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে দোযখের আগুনে'। (বুখারী-মুসলিম)

দোযখের সাতটি স্তর।প্রত্যেক স্তরের শাস্তি অন্য স্তরের শাস্তি থেকে কঠোর। আমল অনুসারে প্রত্যেক স্তরের জন্য পৃথক পৃথক লোক রয়েছে। মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে। এর শাস্তি সর্বাপেক্ষা কঠোর। কাফেরদের শাস্তি দোযখে অব্যাহত থাকবে,বন্ধ হবে না। বরং যতবারই জ্বলে পুড়ে যাবে পুনরায় অধিকতর শাস্তি ভোগ করার জন্য চামড়া পরিবর্তন করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'তাদের চামড়া গুলো যখন জ্বলে পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পাল্টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তাঁরা আযাব আস্বাদন করতে পারে'। (নিসাঃ৫৬) তিনি আরো বলেন, 'আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তাঁরা মরে যাবে এবং তাদের থেকে শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি'।(ফাতিরঃ৩৬)

জাহান্নামীদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করা হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,তুমি ঐ দিন পাপীদেরকে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমন্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে।' (ইবরাহীমঃ ৪৯) জাহান্নামীদের খাবার হবে যাক্কুম বৃক্ষ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ পাপীদের খাদ্য হবে; গলিত তাম্রের মত পেটে ফুটতে থাকবে। যেমন ফুটে গরম পানি' (৪৪ঃ৪৩-৪৬)। রাসূল(সঃ) বলেছেন, 'যদি যাক্কুম বৃক্ষের এক ফোঁটা এ দুনিয়ায় পড়ে দুনিয়াবাসীর জীবন-যাপনকে তিক্ত করে দেবে। যার খাদ্যই তা হবে, তাঁর কি অবস্থা হবে? (তিরমিজী) রাসূলের নিম্নোক্ত বাণীটি জাহান্নামের শাস্তির তীব্রতা ও প্রচন্ডতা এবং জান্নাতের সুখ বিলাসের মহত্ত্ব খুব পরিষ্কার ভাবে বলে দেয়। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভোগ বিলাস ও সুখ আনন্দ উপভোগকারী কাফের ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমিষের জন্য নিক্ষেপ করে বলা হবে, তুমি কি কখনো ও সুখ শান্তি ভোগ করেছ? সে বলবে,না, সুখ শান্তির ছোঁয়া আমি পাইনি। এক মুহূর্তে দুনিয়ার সমস্ত ভোগ বিলাস ভুলে যাবে। অনুরূপভাবে মুমিনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুঃখী মানুষটাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো মাত্র জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি দুঃখ ও ক্লেশ বলতে কিছু ভোগ করেছিলে? সে বলবে,না, আমি কখনোও দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করিনি। এক নিমিষে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্য ভুলে যাবে।। (মুসলিম)

জান্নাতের বিবরণ

জান্নাত চিরস্থায়িত্ব ও মর্যাদার আবাস। আল্লাহর সংবান্দারা এমন নেয়ামত উপভোগ করবে যা চক্ষু কখনোও দেখেনি, কান কখনোও শুনেনি, এমন কি মানুষের অন্তরে কখনোও ধারণা ও কল্পনা রূপেও উদিত হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কেউ জানে না যে, তাঁর জন্য জান্নাতে তাদের আমলের বিনিময়ে চক্ষুশীতল কারী কি কি সামগ্রী যোগাড় রাখা হয়েছে' (৩২ঃ১৭)। মুমিনগণের আমল অনুসারে বেহেশতে তাদের স্তর ও শ্রেণী ভিন্ন হবে। আল্লাহ পাক বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং জ্ঞান প্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন।' (৫৮ঃ১১)

নিজের কামনা ও রুচি অনুযায়ী যা ইচ্ছা পানাহার করবেন। তাতে আছে স্বচ্ছ পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পরিশোধিত মধুর নহর এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শারাবের নহর। তাদের সে শারাব-দুনিয়ার শারাবের মত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, শারাবের ঝর্ণাসমূহ হতে পান পাত্র পূর্ণ করে তাদের মধ্যে ঘুরানো হবে। তা উজ্জ্বল পানীয় পানকারীদের জন্য সুপেয়, সুস্বাদু। না তাদের দেহে তাঁর দরুণ কোন ক্ষতি হবে, না তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাবে। তাদের নিকট দৃষ্টি সংরক্ষণকারী, সুন্দর চক্ষু-বিশিষ্ট নারীগণ হবে (৪৮ঃ৪৫)। আল্লাহর রাসূল বলেন, 'জান্নাতের এক তরুণী যদি দুনিয়াবাসীকে একবার উঁকি মেরে দেখে, তাহলে আসমান ও যমীন আলোকিত হয়ে যাবে এবং ভরে দেবে সুগন্ধে।'। জান্নাতীদের সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত মহান রাব্বুল আলামীনের সাক্ষাৎ লাভ। তাঁরা পেশাব পায়খানা করবে না, ফেলবে না থুথু। চিরুনী হবে স্বর্ণের, ঘাম মিস্কের। এ নেয়ামত অব্যাহত থাকবে কখনোও বন্ধ হবে না। রাসূল (সাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে সব সময় জান্নাতের নেয়ামত উপভোগ করবে। কোন দিন এ নেয়ামত থেকে সে বঞ্চিত হবেনা। জান্নাতের সর্ব নিম্ন নেয়ামত পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর চেয়ে দশ গুণ শ্রেয়। আর এই নেয়ামত সেই ব্যক্তি লাভ করবে যাকে সর্ব শেষে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

مختصر السيرة النبوية

নবী জীবনী

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরবের অবস্থা

মূর্তি পূজাই ছিল আরব দেশে প্রচলিত ধর্ম। সত্য ধর্মের পরিপন্থী এ ধরণের মূর্তিপূজাবাদ অবলম্বন করার কারণে তাদের এ যুগকে আইয়ামে জাহেলিয়াত তথা মূর্খতার যুগ বলা হয়। লাত, উযযা, মানাত ও হুবল ছিল তাদের প্রসিদ্ধ উপাস্যগুলোর অন্যতম। আরবের কিছু লোক ইহুদী বা খৃষ্টান ধর্ম বা অগ্নি পূজকদের ধর্ম গ্রহণ করেছিল। আবার স্বল্প সংখ্যক লোক ছিল যারা ইবরাহিম (আঃ) এর প্রদর্শিত পথে ছিল অবিচল, আঁকড়ে ধরেছিল তাঁর আদর্শ। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বেদুঈনরা সম্পূর্ণ ভাবে পশুসম্পদের উপর নির্ভর করত। আর নগরবাসীদের নিকট অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিল কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশে মক্কাই ছিল বৃহত্তর বাণিজ্য নগরী। অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নয়ন ও নাগরিক সভ্যতা ছিল। সামাজিক দিক দিয়ে যুলুম সর্বত্র বিরাজমান ছিল, সেখানে দুর্বলের ছিলনা কোন অধিকার। কন্যা সন্তানকে জীবদ্দশায় দাফন করা হতো। মান-ইজ্জত ও সম্মানকে করা হতো পদদলিত। সবল দুর্বলের অধিকার হরণ করতো। বহুবিবাহ প্রথার কোন সীমা ছিল না। ব্যভিচার অবাধ ভাবে চলতো। নগণ্য ও তুচ্ছ কারণে যুদ্ধের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠতো। সংক্ষেপে বলতে গেলে,ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব দ্বীপের সার্বিক পরিস্থিতি এ ধরণের ভয়াবহই ছিল।

ইবনুযযাবিহাঈন

রাসূলের দাদা আব্দুল মুত্তালিবের সাথে কুরাইশরা ছেলে-সন্তান ও সম্পদের গৌরব ও অহংকার প্রদর্শন করতো। তাই তিনি মানত করলেন যে, আল্লাহ যদি তাকে দশ জন ছেলে দান করেন, তাহলে তিনি একজনকে কথিত খোদার নৈকট্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে যবেহ করবেন। তাঁর সাধ বাস্তব রূপ পেল। দশ জন ছেলে জুটলো তাঁর ভাগ্যে। তাদের একজন ছিলেন নবীর পিতা আব্দুল্লাহ। আব্দুল মুত্তালিব মানত পূরণ করতে চাইলে লোকজন তাঁকে বাধা দেয়, যাতে এটা মানুষের মধ্যে প্রথা না হয়ে যায়। অতঃপর সবাই আব্দুল্লাহ এবং দশটি উটের মধ্যে লটারীর তীর নিক্ষেপ করতে সম্মত হয়। যদি লটারীতে আব্দুল্লাহর নাম আসে, তাহলে প্রতিবার ১০ টি করে উট সংখ্যায় বৃদ্ধি করা হবে। লটারী বারংবার আব্দুল্লাহর নামে আসতে থাকে। দশমবারে লটারী উটের নামে আসে যখন তার সংখ্যা ১০০ তে দাড়ায়। ফলে তারা উট যবেহ করল এবং রক্ষা পেলো আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহ তার পিতা আব্দুল মুত্তালিবের সব চাইতে প্রিয় ছেলে ছিল। বিশেষতঃএ ঘটনার পর এবং তার কপালে বিরল বরং নজিরবিহীন জ্যোতি ও দীপ্তি প্রতিভাত হবার পর আব্দুল মুত্তালিবের স্নেহ ও আদর অনেক বেড়ে যায়। আব্দুল্লাহ তারুণ্যের সীমায় পা রাখলে, তার পিতা বনী যোহরা গোত্রের আমেনা বিনতে ওয়াহাব নামক এক তরুণীর সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। বিয়ের পর আব্দুল্লাহর ললাটে ঝলমলকারী সে জ্যোতি লোপ পেয়ে আমেনার গর্ভে স্থির হয়। আব্দুল্লাহ জীবন ও অস্তিত্বের মধ্যে নিজের দায়িত্ব পালন করে ফেলে। আমেনা অন্তঃসত্বা হবার তিন মাস পর আব্দুল্লাহ এক বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে রোগাক্রান্ত হয়ে মদীনায় বনীনাজ্জার গোত্রে তার মামাদের কাছে অবস্থান করে এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় সেখানে। এদিকে গর্ভের মাসগুলো পুরো হয়ে প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসলো। আমেনা অবশেষে সন্তান প্রসব করলো। কিন্তু সাধারণ নারীদের মত কোন প্রকার প্রসব বেদনা অনুভব করেনি। আর এ ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয় ৫৭১ইং এর ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার ভোরবেলায়।

উল্লেখ্য যে সে বছরেই হস্তী বাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।

হস্তী বাহিনীর ঘটনা

হস্তী বাহিনীর সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো,

আবরাহা ছিল ইথিওপিয়ার শাসক কর্তৃক নিযুক্ত ইয়ামানের গভর্নর। সে আরবদেরকে কাবা শরীফে হজ্জ্ব করতে দেখে সানআতে (বর্তমানে ইয়ামানের রাজধানী) এক বিরাট গির্জা নির্মাণ করলো, যেন আরবরা এ নব নির্মিত গির্জায় হজ্জ্ব করে। কেনানা গোত্রের এক লোক (আরবের একটা গোত্র) তা শুনার পর রাতে প্রবেশ করে, গির্জার দেয়ালগুলোকে পায়খানা ও মলমূত্র পঙ্কিল করে দেয়। আবরাহা এ কথা শুনার পর রাগে ক্ষেপে উঠলো। ৬০হাজারের এক বিরাট সেনা বাহিনী নিয়ে কাবাশরীফ ধ্বংস করার জন্য রওয়ানা হলো। নিজের জন্য সে সব চেয়ে বড় হাতীটা পছন্দ করলো। সেনাবাহিনীর মধ্যে নয়টি হাতী ছিল। মক্কা নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত তারা যাত্রা অব্যাহত রাখলো। তারপর সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করে মক্কা প্রবেশ করায় উদ্যত হলো, কিন্তু হাতী বসে গেল কোনক্রমেই কাবার দিকে অগ্রসর করানো গেলনা। যখন তারা হাতীকে কাবার বিপরীত দিকে অগ্রসর করাতো, দ্রুত সে দিকে অগ্রসর হতো কিন্তু কাবার দিকে অগ্রসর করাতে চাইলে, বসে পড়তো। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাদের প্রতি প্রেরণ করেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, যা তাদের উপর পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করা শুরু করে দিয়েছিল। অতঃপর তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করে দেয়া হয়। প্রত্যেক পাখি তিনটি করে পাথর বহন করছিল। ১টি পাথর ঠোঁটে আর দুটি পায়ে। পাথর দেহে পড়া মাত্র দেহের সব অঙ্গ-প্রতঙ্গ টুকরো টুকরো হয়ে যেতো। যারা পলায়ন করে তারাও পথে মৃত্যুর ছোবল থেকে রক্ষা পায়নি।

আবরাহা এমনি একটি রোগে আক্রান্ত হয়, যার ফলে তার সব আঙ্গুল পড়ে যায় এবং সে সানআয় পাখির ছানার মত পৌঁছালো এবং সেখানে তার মৃত্যু হলো। কুরাইশরা গিরিপথে বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং সেনাবাহিনীর ভয়ে পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিল। আবরাহার সেনাবাহিনীর এ অশুভ পরিণামের পর তারা নিরাপদে ঘরে ফিরে আসে। রাসূলে করীম (দঃ) এর জন্মের ৫০দিন পূর্বে এ ঘটনা সংঘটিত হয়।

দুগ্ধ পান

আরবদের প্রথা ছিল যে, তারা তাদের শিশুদেরকে বেদুঈন অধ্যুষিত মরু অঞ্চলে লালন-পালন করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিত। সেখানে তাদের দৈহিক সুস্থতার অনুকূল পরিবেশ ছিল। রাসূলের পবিত্র জন্ম লাভের পর বনীসাদ গোত্রের কিছু বেদুঈন লোক মক্কায় আসে। তাদের মহিলারা মক্কার ঘরে ঘরে শিশুর অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু রাসূলের পিতৃহীনতা ও দারিদ্র্যের কারণে কেউ তাঁকে নেয়নি। হালিমা সাদিয়াও ছিল তাদের মধ্যে একজন। সবার মত সেও ছিল বিমুখ। শিশু পালনের পারিশ্রমিক দিয়ে জীবনের অভাব অনটন বিমোচন করা ও জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা দূর করার লক্ষ্যে মক্কার অধিকাংশ ঘরে শিশুর অনুসন্ধান করেও সফল হয়নি সে। অধিকন্তু সে বছরে ছিল অনাবৃষ্টি ও খরা। তাই স্বল্প পারিশ্রমিকে এতীম সন্তানকে নেয়ার উদ্দেশ্যে আমেনার ঘরে আবার ফিরে আসে সে। হালিমা আপন স্বামীর সাথে মক্কায় মন্থর গতিতে চলে এমন একটি দুর্বল গাধিনী নিয়ে এসেছিল। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে রাসূলকে কোলে নেয়ার পর গাধিনী অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলতেছিল এবং অন্যান্য সব জানোয়ারকে পিছনে ফেলে আসছিল। ফলে সফর সঙ্গীরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়। হালিমা আরো বর্ণনা করেন যে, তাঁর স্তনে কোন দুধ ছিল না, তাঁর ছেলে ক্ষুধায় সর্বদা কাঁদতো। রাসূলে করীম (দঃ) তাঁর পবিত্র মুখ স্তনে রাখার পর প্রচুর পরিমাণে দুধ তাঁর স্তনে আসতে লাগলো। বনী সাদ গোত্রের অধ্যুষিত অঞ্চলের অনাবৃষ্টি সম্পর্কে বলে যে,এ শিশু (মহাম্মদ) দুধ পান করার বদৌলতে জমিতে উৎপন্ন হতে লাগলো ফল মূল এবং ছাগল ও অন্যান্য পশু দিতে লাগলো বাচ্চা। অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। দারিদ্র্য ও

অভাব-অনটনের পরিবর্তে সুখ ও সমৃদ্ধি সর্বত্র বিরাজমান। মুহাম্মাদ (দঃ) হালিমার পরিচর্যায় দুবছর পালিত হোন। তিনি তাঁর সর্বতোভাবে যত্নশীলা ছিলেন। এই শিশুকে কেন্দ্র করে হৃদয়ের গভীরে তিনি বহু অলৌকীক কর্ম-কান্ড ও অবস্থা উপলব্ধি করতেন। দু'বছর শেষ হবার পর হালিমা তাকে মক্কায় মাতা ও দাদার কাছে নিয়ে আসলো। কিন্তু হালিমা রাসূলের বরকত অবলোকন করে যে বরকত তাঁর অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় আমেনার কাছে রাসূলকে দ্বিতীয় বার দেয়ার জন্য আবেদন করলো। আমেনা তাতে সম্মত হয়। হালিমা এতীম শিশুকে নিয়ে নিজ এলাকায় আনন্দ ও সন্তোষ সহকারে ফিরে আসে।

বক্ষ বিদারণ

এক দিন শিশু মুহাম্মাদ হালিমার ছেলের সাথে তাঁবু থেকে দূরে খেলা-ধুলা করছিল। এ সময় তাঁর বয়স ছিল চার বছরের কাছা কাছি। এমতাবস্থায় হালিমার ছেলে ভীত সন্ত্রস্ত ও আতংকগ্রস্ত হয়ে মায়ের কাছে দৌড়ে এসে তাকে কুরাইশী ভায়ের সাহায্যে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানালো। ঘটনা কি জিজ্ঞেস করা হলে সে উত্তর দেয় যে, দু'জন সাদা পোশাক পরিহিত লোককে আমাদের কাছ থেকে মুহাম্মাদকে নিয়ে মাটিতে চিৎ করে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করতে দেখেছি। তাঁর বর্ণনা শেষ না করতেই হালিমা ঘটনাস্থলের দিকে দৌড়ে যান। গিয়ে দেখেন মুহাম্মাদ নিজ স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। হলুদ বর্ণ মুখমন্ডলে ভেসে গেল। দেহ তাঁর ফ্যাকাশে। তাঁকে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে অত্যন্ত শান্তভাবে জবাব দেন যে, তিনি ভাল আছেন। তিনি আরো বলেন, সাদা পোশাক পরিহিত দু'ব্যক্তি এসে তাঁর বক্ষবিদীর্ণ করে হৃদয় বের করে কাল জমাট বাঁধা রক্ত বের করে ফেলে দেয়, এবং হৃদয়কে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে আবার যথাস্থানে রেখে দেয়। বক্ষ মুছিয়ে দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। হালিমা বক্ষের সে স্থানটি স্থির করার চেষ্টা করেও কোন চিহ্ন দেখতে পেলেন না। এর পর মুহাম্মাদকে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে আসেন। পরের দিন ভোর হতেই হালিমা মুহাম্মাদকে তাঁর মায়ের কাছে মক্কায় নিয়ে আসেন। আমেনা অনির্ধারিত সময়ে হালিমাকে ছেলে নিয়ে আসতে দেখে আশ্চর্যান্বিত হন, অথচ তিনি ছেলেকে অন্তর থেকে দেখতে চাচ্ছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে হালিমা বক্ষ বিদারণের ঘটনার পুরো বিবরণ দেন।

আমেনার মৃত্যু

আমেনা নিজের এতীম শিশু মুহাম্মাদকে নিয়ে ইয়াসরাবে বনী নাজ্জার গোত্রে মামাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য যাত্রা করেন। সেখানে কিছু দিন অবস্থান করে ফেরার পথে "আবওয়া" নামক স্থানে মৃত্যু বরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। ফলে মুহাম্মাদ ছয় বছর বয়সে মাতৃ-স্নেহ ও আদরের ছায়া থেকে বঞ্চিত হন। দাদা আব্দুল মুত্তালিবকে এ অপূরণীয় ক্ষতির কিছুটা লাঘব করতে হবে। তাই তিনি তাঁর দেখা-শুনা ও পরিচর্যার দায়িত্ব নেন। রাসূল (দঃ) যখন আট বছর বয়সে পা রাখেন, তখন তাঁর দাদা ইহকাল ত্যাগ করেন। অতঃপর চাচা আবুতালিব আর্থিক অভাব-অনটন ও পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশী থাকা সত্ত্বেও তাঁর দেখা-শুনার দায়িত্ব নেন। রাসূলের চাচা আবু তালেব ও তাঁর স্ত্রী রাসূলের সাথে আপন ছেলের ন্যায় আচরণ করেন। এতীম ছেলের সম্পর্ক আপন চাচার সাথে অনেকটা গভীর হয়ে যায়। এ পরিবেশে তিনি বড় হয়ে উঠেন। সততা ও সত্যবাদিতার মত গুণে গুণান্বিত হয়ে যৌবনকাল অতিবাহিত করেন। এমন কি, কেউ যদি বলে, 'আল-আমীন' উপস্থিত হয়েছেন, বুঝা হতো মুহাম্মাদ (দঃ) আগমন করেছেন।

রাসূল যখন কিছুটা বড় হয়ে যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে জীবিকার্জনের চেষ্টা শুরু করেন। শ্রম ব্যয় ও উপার্জনের পালা আরম্ভ হলো। তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরাইশের কিছু লোকের ছাগলের রাখাল হিসেবে কাজ করেন। খাদীজা বিনতে খোয়াইলিদ কর্তৃক আয়োজিত এক বাণিজ্যিক ভ্রমণে সিরিয়া গমন করেন। খাদীজা ছিলেন বিত্তশালিনী মহিলা। সে ভ্রমণে সম্পদ ও ব্যবসায়িক সামগ্রীর তত্ত্বাবধায়ক

ছিল তাঁরই দাস "মাইসারাহ"। রাসূলের বরকত ও সততার কারণে খাদীজার এ ব্যবসায়ে নজীরবিহীন লাভ হয়। তিনি স্বীয় দাস মাইসেরাহর কাছে এর কারণ জানতে চাইলে বলা হয়, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ নিজেই বেচা-কেনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ক্রেতার ঢল নামে। ফলে কোন যুলুম করা ব্যতিরেকেই আয় হয় প্রচুর। খাদীজা তাঁর দাসের বর্ণনা মনোযোগ দিয়ে শুনেন। এমনিতেও তিনি মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন। তিনি মুহাম্মাদের প্রতি হয়ে পড়েন মুগ্ধ ও অভিভূত। ইতিপূর্বে তিনি একবার বিয়ে করেছিলেন। স্বামী মারা যাওয়ার পরে বিধবাই রইলেন। এখন পুনরায় তাঁর মধ্যে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহর সাথে নতুন অভিজ্ঞতায় প্রবেশ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে। তাই এ ব্যাপারে মুহাম্মাদের মনোভাব জানার উদ্দেশ্যে নিজের এক আত্মীয়াকে পাঠান। মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বয়স তখন পঁচিশে উন্নীত হয়। রাসূলের নিকট খাদীজার আত্মীয়া বিয়ের প্রস্তাব রাখলে তিনি তা গ্রহণ করেন। বিয়ে সম্পাদিত হলো। একে অপরের দ্বারা সুখী হন। তিনি খাদীজার অর্থ সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় যোগ্যতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। খাদীজার গর্ভে জন্ম লাভ করেন যয়নাব, রুকাইয়্যাহ, উম্মেকুলসুম ও ফাতিমা। আর কাসিম ও আব্দুল্লাহ নামক দু' ছেলে যারা শৈশবেই মারা যান।

তাঁর বয়স চল্লিশের নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে মক্কার অদূরে অবস্থিত হেরা নামক এক গুহায় তিনি নিরিবিলি ও নির্জন অবস্থায় কয়েক দিন করে কাটিয়ে দিতেন। পবিত্র রমযানের ২১ তারিখের রাতে হেরা গুহায় তাঁর কাছে জিবরাঈল (আঃ) আসেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০। জিবরাঈল বলেন, পড়ুন। তিনি বললেন, আমি পড়তে জানি না। জিবরাঈল দ্বিতীয় বার ও তৃতীয়বারের মত পুনরায় বললেন। তৃতীয়বার জিবরাঈল বলেন,

﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم﴾

অর্থঃ পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহাদয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না। (আলাক ১-৫) অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) চলে গেলেন। রাসূল (সাঃ) আর হেরা গুহায় অবস্থান করতে পারলেন না। তিনি ঘরে এসে খাদীজাকে হৃদয় স্পন্দিত অবস্থায় বলেন, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর। অতঃপর তিনি বস্ত্রাচ্ছাদিত হয়ে শুয়ে পড়লেন। ভীত ও আতংক দূর হয়ে গেলে তিনি সব কিছু খাদীজাকে খুলে বললেন। এর পর তিনি বললেন, আমি নিজের ব্যাপারে আশংকা বোধ করছি। খাদীজা দৃঢ়তার সাথে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কখনো নয়, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনাকে অপমানিত করবেন না। নিশ্চয় আপনি আত্মীয় স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন, গরীব ও নিঃস্ব ব্যক্তিকে সাহায্য করেন। অতিথিকে সমাদর করেন এবং বিপদগ্রস্তদের সহায়তা করেন"। কিছু দিন পরে তিনি আল্লাহর ইবাদত অব্যাহত রাখার জন্য আবার হেরা গুহায় ফিরে আসেন। রমযানের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটান। রমযান শেষে হেরা গুহা থেকে অবতরণ করে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। উপত্যকায় পৌঁছলে জিবরাঈলকে আকাশ ও যমিনের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখেন। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। "হে চাদরাবৃত! উঠুন, সতর্ক করুন, আপনার পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন। আপনার পোশাক পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা দূর করুন।" (মুদ্দাস্সির-১-৫)

পরবর্তী সময়ে ওহী অব্যাহত থাকে। রাসূল (সঃ) পবিত্র দাওয়াতী ব্রত শুরু করলে সর্ব প্রথম তাঁর গুণবতী স্ত্রী খাদীজা রাঃ ঈমানের ডাকে সাড়া দেন। আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর স্বামীর নবুওয়াতের সাক্ষ্য দেন। তাই তিনি ছিলেন সর্ব প্রথম মুসলমান। রাসূল (সঃ) আপন চাচা আবুতালিবের স্নেহ, পরিচর্যা ও অবদানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ, যে রাসূলের মাতা ও দাদার পর দেখা-শুনার দায়িত্ব বহন করেন, তাঁর ছেলে আলীর লালন-পালন ও দেখা-শুনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এ সুন্দর পরিবেশে আলীর অন্তর ও বিবেক খুলে যায়। তিনিও ঈমান গ্রহণ করেন। অতঃপর খাদীজার দাস যাইদ বিন হারেসাহ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত হন। অতঃপর

রাসূল তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু আবু বাকারের সাথে ইসলামের ব্যাপারে আলাপ করলে দ্বিধাহীন চিত্তে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সত্যতার সাক্ষ্য দেন।

রাসূল (সঃ) গোপন ভাবে দাওয়াতী মিশন চালিয়ে যেতে থাকলেন। আর গোপন বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে গোপনীয় স্থান, যেখানে তাঁর সাহাবী, শিষ্য ও আরো অনেক লোক সমবেত হতেন। তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করতেন। অতঃপর তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করতেন। এ ভাবে অনেক লোক ইসলামের পতাকাতলে একত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু সবাই ইসলামকে গোপন রাখতেন। কারো ইসলাম গ্রহণের বিষয়টা প্রকাশ হয়ে গেলে কুরাইশের কাফেরদের কঠিন নির্যাতনের শিকার হতেন। এসময়ে ব্যক্তিগতভাবে টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ করা হতো।

প্রকাশ্য দাওয়াত

এ ভাবে রাসূল (সঃ) তিন বছর পর্যন্ত ব্যক্তিগত দাওয়াতের গোপন ব্রতে ব্যস্ত থাকেন। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দেন, যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরোয়া করবেন না, (হিজরঃ৯৪) এ আদেশ পেয়ে এক দিন তিনি সাফা পর্বতে আরোহণ করে কুরাইশদেরকে ডাক দেন। তাঁর ডাক শুনে অনেক লোকের সমাগম ঘটে। তন্মধ্যে তাঁর চাচা আবু লাহাবও একজন ছিল। সে কুরাইশদের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সব চাইতে কট্টর শত্রু ছিল। মানুষ সমবেত হবার পর রাসূল (সঃ) বললেন,আমি যদি আপনাদেরকে একথার সংবাদ দিই যে, পাহাড়ের পেছনে এক শত্রুদল আপনাদের উপর আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন? সবাই এক সুরে বললো, আমরা আপনার মধ্যে সততা ও সত্যবাদিতা ছাড়া কিছুই দেখিনি। তিনি বললেন, আমি আপনাদেরকে কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি। অতঃপর তিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করলেন এবং মূর্তিপূজা বর্জন করতে বললেন। একথা শুনে আবুলাহাব রাগে ক্ষেপে উঠে বলে,তোমার ধ্বংস হোক। এ জন্যেই কি আমাদেরকে একত্রিত করেছ। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক সূরা লাহাব অবতীর্ণ করেন। "আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে। কোন কাজে আসেনি তাঁর ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। সত্বর সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে। তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।" (লাহাব- ১-৫)

রাসূল (সঃ) দাওয়াতী কাজ পুরো দমে অব্যাহত রাখলেন। জন সমাবেশ স্থলে তিনি প্রকাশ্যভাবে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতেন। তিনি কা'বা শরীফের নিকটে নামায আদায় করতেন। মুসলমানদের উপরে কাফেরদের অত্যাচার ও নিপীড়নের মাত্রা বেড়ে গেলো। ইয়াসের, সুমাইয়া ও তাদের সন্তান আম্মারের বেলায় তাই ঘটেছে। খোদাদ্রোহীদের নির্যাতনে পিতা-মাতা শহীদ হন। সুমাইয়া ইসলামে প্রথম শহীদের মর্যাদায় ভূষিত হন। নির্যাতনের কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিলাল বিন রাবাহ আবুজেহেলের ও উমাইয়া বিন খালাফের অকথ্য নির্যাতনের শিকার হন। অবশ্যই বিলাল হযরত আবু বাকারের (রাঃ) মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ খবর শুনে তাঁর মালিক অত্যাচারের সব পন্থা অবলম্বন করে যাতে বিলাল ইসলাম ত্যাগ করে। কিন্তু তিনি আঁকড়ে ধরেন ইসলামকে এবং অস্বীকার করেন ইসলাম ত্যাগ করতে। উমাইয়া তাঁকে শিকলাবদ্ধ করে মক্কার বাহিরে নিয়ে গিয়ে বুকের উপর বিরাট পাথর রেখে উত্তপ্ত বালিতে হেঁচড়াইয়া টানতো। অতঃপর সে ও তাঁর সঙ্গীরা বেত্রাঘাত করতো আর বিলাল শুধু আহাদ, আহাদ, এক, এক, বলতে থাকতেন। এহেন অবস্থায় একবার আবু বাকর তাকে দেখেন। তিনি বিলালকে উমাইয়ার কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়ে আল্লাহর নিমিত্তে স্বাধীন করে দেন। এ সব পৈশাচিক ও বর্বর অত্যাচারের কারণে রাসুল (সঃ) মুসলমানদেরকে ইসলাম প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। তাদের সাথে মিলিত হতেন অত্যন্ত সংগোপনে। কেননা প্রকাশ্যভাবে মিলিত হলে মুশরিকরা রাসূলের শিক্ষা প্রদানের পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করবে। কখনো দুদলের সংঘর্ষের আশংকাও ছিল। এ কথা সুবিদিত

যে, এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে সংঘর্ষ মুসলমানদের ধ্বংস ও সমূলে বিনাশই ডেকে আনবে। কারণ মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি সামর্থ্য ছিল খুবই স্বল্প। তাই তাদের ইসলাম গোপন রাখাটাই ছিল দূরদর্শিতা। অবশ্য রাসূল (দঃ) কাফেরদের অত্যাচার সত্ত্বেও প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত ও এবাদতের কাজ করতেন।

হাবশার দিকে হিজরাত

যাঁর ইসলামের কথা ফাঁস হয়ে যেত, তিনি মুশরিকদের নিপীড়নের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতেন। বিশেষত দুর্বল মুসলমানেরা। এ পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল (দঃ) সাহাবীদেরকে দ্বীন নিয়ে হাবশায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। তিনি সেখান কার শাসক নাজাসীর নিকট নিরাপত্তা পাওয়ার আশ্বাস দেন। অনেক মুসলমান নিজের জান ও পরিবার বর্গের ব্যাপারে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতো। তাই নবুওয়াতের ৫ম বছরে প্রায় ৭০জন মুসলমান সপরিবারে হিজরত করেন। তাঁদের মধ্যে উসমান বিন আফফান ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়্যাও ছিলেন। এ দিকে কুরাইশরা ইথিওপিয়ায় হিজরত কারীদের অবস্থান ব্যাহত করার চেষ্টা করে।সে দেশের রাজার জন্য প্রচুর উপঢৌকন পাঠায়। পলায়নকারীদের (মুহাজির) বহিস্কারের অনুরোধ জানায়। তাঁরা আরো বলে যে, মুসলমানরা ঈসা (আঃ) ও মরিয়াম সম্পর্কে অপমানকর ও অশিষ্ট বাক্য ব্যবহার করে। নাজাসী তাদেরকে ঈসা (আঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা সত্যটি সুস্পষ্ট ভাবে বলে দেন। শাসক মুসলমানদের আশ্রয় দেন এবং বহিস্কার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। এ বছরের রমযান মাসে রাসূল (দঃ) হারাম শরীফে যান।সেখানে ছিল কুরাইশের এক দল লোক। তিনি দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে তাদের সামনে সূরায়ে নাজম তেলাওয়াত করতে লাগলেন। এ সব কাফেররা ইতিপূর্বে কখনো আল্লাহর বাণী শুনেনি। কেননা তাঁরা রাসূলের কিছুই না শুনার পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছিলো। অকস্মাৎ তেলাওয়াতের মধুর ধ্বনি তাদের কর্ণে গেলে তাঁরা আল্লাহর হৃদয়গ্রাহী চিত্তাকর্ষক বাণী ও সাবলীল ভাষা একাগ্রচিত্তে শুনে। অন্তরে তা ছাড়া অন্য কিছুই নেই। এক পর্যায়ে রাসূল ﴿فاسجدوا لله واعبدوا﴾ আয়াতটি পড়ে সেজদায় চলে যান। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউই নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রন করতে পারেনি। তাঁরাও সেজদায় চলে যায়। অনুপস্থিত মুশরিকরা তাদেরকে তিরস্কার করে,করে ভর্ৎসনা। অন্য কোন উপায় না দেখে এরা রাসূলের বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে যে, তিনি তাদের মূর্তির প্রশংসা করেন এবং বলেন, "তাদের (মূর্তিসমূহের) সুপারিশের আশা করা যায়" সেজদা করার অজুহাত স্বরূপ এ ভিত্তিহীন,নিরেট মিথ্যার বেসাতী করে তারা।

ওমারের ইসলাম গ্রহণ

ওমারের ইসলাম গ্রহণ মুসলমানদের জন্য বড় বিজয় ছিল। রাসূল (দঃ) তাঁকে ফারুক বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ আল্লাহতায়ালা তাঁর মাধ্যমে সত্য ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করেছেন। ইসলাম গ্রহণের কয়েক দিন পরে ওমার রাসূল (সাঃ) কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি সত্যের উপরে নই? তদুত্তরে তিনি বললেন, কেন নয়, নিশ্চয় আমরা সত্যের মধ্যে। ওমার বললেন, তাহলে এত গোপনীয়তা কি জন্যে। তখন আরকামের বাড়ীতে সমবেত মুসলমানদেরকে নিয়ে বের হয়ে পড়েন এবং তাদেরকে দ'দলে বিভক্ত করে দেন। হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে একদল এবং ওমার বিন খাত্তাবের নেতৃত্বে আর একদল দাওয়াতী যাত্রার নব সঞ্চারিত শক্তির ইঙ্গিত দেয়ার জন্যে মক্কার বিভিন্ন অলি-গলি প্রদক্ষিণ করে। কুরাইশরা দাওয়াত দমন করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। শাস্তি, নির্যাতন, নিপীড়ন,প্রলোভন ও হুমকি প্রদর্শনের মতো সর্ব প্রকার পন্থা গ্রহণ করে। কিন্তু এসব কু পরিকল্পিত ব্যবস্থাসমূহ মুসলমানদের ঈমান বৃদ্ধি ও দ্বীন ইসলামকে অধিকতর আঁকড়ে ধরা ছাড়া আর কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।

এক নতুন দুরভিসন্ধি ও মন্দ অভিপ্রায় তাদের অন্তরে জন্ম নিল। আর তা হচ্ছে মুসলমান ও বনী হাশেমকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন ও একঘরে করে রাখার এক চুক্তিনামা লিখে, যাতে সবাই স্বাক্ষর করবে, কাবাশরীফের অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে দেবে। চুক্তি অনুসারে তাদের সাথে বেচা-কেনা, বিয়ে-শাদি, সাহায্য-সহযোগিতা ও লেন-দেন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। এ চুক্তির ফলে মুসলমানেরা বাধ্য হয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে (শো'বে আবি তালেব নামক) এক উপত্যকায় গিয়ে আশ্রয় নেন। তাঁরা অবর্ণনীয় ক্লেশ ও দুঃখের শিকার হন সেখানে। ক্ষুধা ও অর্ধাহারের বিষাক্ত ছোবল থেকে কেউ রক্ষা পায়নি। সুস্থল ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করে ফেলেন। খাদীজা তাঁর সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করেন। বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়লো। অধিকাংশ লোকই মৃত্যুর প্রায়-দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁরা ধৈর্য অবিচলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তাঁদের মধ্যে একজনও পশ্চাদপদ হননি। অবরোধ একাধারে তিন বছর স্থায়ী রইল। অতঃপর বানী হাশেমের সাথে আত্মীয়তা আছে এমন কিছু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি জনসমাবেশে চুক্তি ভঙ্গ করার কথা ঘোষণা করে। চুক্তির কাগজ বের করা হলে দেখা যায় যে সেটা খেয়ে ফেলা হয়েছে। শুধু মাত্র কাগজের এক কোণ যেখানে "বিসমিকা আল্লাহুম্মা" লেখাছিল সেটাই অক্ষত রয়েছে। সংকটের অবসান হল। আর মুসলমান ও বানী হাশেম মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু কুরাইশরা মুসলমানদের দমন ও মুকাবিলায় সেই রকম রূঢ়তা ও কঠোরতা ক্ষনিকের তরেও পরিহার করেনি।

দুঃখের বছর

কঠিন রোগ ব্যাধি আবু তালেবের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে যায়। মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয়ে জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্তগুলো গুনতে লাগলেন। মুমূর্ষাবস্থায় যখন সে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর তখন রাসূল তাঁর মাথার পার্শ্বে বসে তাকে কালেমায়ে তাওহীদ الله لا إله إلا পড়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু আবু জেহেল সহ অসৎ সঙ্গীরা যারা তাঁর পার্শ্বে ছিল, তাকে বললো,শেষমুহূর্তে পূর্ব পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করো না। মুসলমান হওয়া ব্যতিরেকে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় রাসূলের দুঃখ দ্বিগুন বেড়ে যায়। আবু তালেবের মৃত্যুর দু'মাস পরে হযরত খাদীজা (রাঃ) ওফাত বরণ করেন। ফলে রাসূল (দঃ) অত্যন্ত চিন্তিত হন।তাঁদের মৃত্যুর পরে কুরাইশের ঔদ্ধত্য ও উপদ্রব আরো বেড়ে যায়।

তায়েফের পথে

কুরাইশের ধৃষ্টতা এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের নির্যাতন ও নিপীড়নের নীতি অব্যাহত থাকার পর রাসূল (দঃ) তাদের সংশোধন ও ইসলাম গ্রহণ থেকে নিরাশ হয়ে তায়েফ গমনের সিদ্ধান্ত নেন। হতে পারে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দান করবেন। তায়েফ গমন সহজ ব্যাপার ছিল না। আকাশ চুম্বি উচু উচু পাহাড়ের কারণে পথ ছিল দুর্গম। কিন্তু আল্লাহর পথে প্রত্যেক দুরূহ বস্তু সহজ হয়ে পড়ে। তায়েফবাসীরা রাসূলের (দঃ) সাথে সর্বাপেক্ষা মন্দ আচরণ করে। তাঁরা শিশু-কিশোরদেরকে লেলিয়ে দেয়। প্রস্তর নিক্ষেপ করে তাঁর গোড়ালী করে রক্তে রঞ্জিত। তিনি ভীষণ চিন্তিত হয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। পথি মধ্যে জিবরাঈল (আঃ) পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতাসহ এসে বলেন,আল্লাহ পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি যা ইচ্ছা নির্দেশ দিতে পারেন। ফেরেশতা আরজ করলো, হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি চান আমি তাদের উপর আখসাবাইন (মক্কাকে ঘিরে রাখা পাহাড়) চেপে দিবো। তিনি বললেন,বরং আমি আশা করি আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যারা শুধু মাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন শরীক স্থাপন করবে না।

চন্দ্র দু'টুকরো হওয়া

মুশরিকরা অনেক সময় রাসূলকে অপারগ, অক্ষম সাব্যস্ত করার ফন্দিতে বিভিন্ন অলৌকিক নিদর্শন দেখানোর দাবী করতো। আর এ ধরণের দাবী বারংবার উত্থাপন করেছে তাঁরা। এক বার চন্দ্রকে দু'টুকরো করার দাবী জানায়, রাসূল (সাঃ) আল্লাহর কাছে দোয়া করলে তাদেরকে চন্দ্র দু'টুকরো করে দেখানো হয়। কুরাইশরা এ নিদর্শন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দেখতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা ঈমান গ্রহণ করেনি। বরং তাঁরা বলে, মুহাম্মাদ আমাদেরকে যাদু করেছে তন্মধ্যে এক ব্যক্তি বললো, আমাদের যাদু করলেও সব মানুষকে তো আর যাদু করতে পারবে না। দূতের অপেক্ষা কর। বিভিন্ন দূত আসলে জিজ্ঞেস করা হয় এবং তাঁরা বলে, হ্যাঁ আমরাও দেখেছি। কিন্তু কুরাইশরা নিজেদের কুফরে জেদ ধরে রয়ে গেলো। চন্দ্র দু' টুকরো হওয়া এক বৃহত্তর অলৌকিক ঘটনার পটভূমি ও অবতরণিকা ছিলো। আর তা হল মেরাজের ঘটনা।

মেরাজ

তায়েফ থেকে ফিরে আসা, তাদের রূঢ় ও অমানবিক আচরণ এবং আবু তালিব ও খাদীজার মৃত্যুর পর কুরাইশের অত্যাচার বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে একাধিক চিন্তা একত্রিত হয়। মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে শোকাহত ও দুঃখে কাতর নবীর সান্ত্বনা আসে। তাই তিনি যখন রাত্রে নিদ্রারত ছিলেন, জিবরাঈল বুরাক নিয়ে আসেন।বোরাক ঘোড়া সদৃশ এক জন্তু যার দু'টি দ্রুতমান পাখা ছিল বিদ্যুতের ন্যায়। রাসূল (সাঃ) কে তাতে আরোহণ করানো হয় এবং জিবরাঈল তাকে ফিলিস্তিনে বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রথমে নিয়ে যান। অতঃপর সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত নিয়ে যান। এ ভ্রমণে তিনি পালনকর্তার বড় বড় নিদর্শন পরিদর্শন করেন। আসমানেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হয়। তিনি একই রাত্রে তুষ্ট মন ও সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মক্কায় প্রত্যাগমন করেন। ভোর বেলায় কাবাশরীফে গিয়ে তিনি লোকদেরকে একথা শুনালে কাফেরদের মিথ্যার অভিযোগ ও ঠাট্টা- বিদ্রূপ আরো বেড়ে যায়। উপস্থিত কয়েকজন লোক তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসের বিবরণ দিতে বলে। মূলতঃ উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে অপারগ ও অক্ষম প্রমাণিত করা। তিনি তন্ন তন্ন করে সব কিছু বলতে লাগলেন। কাফেররা এতে ক্ষান্ত না হয়ে বলে, আমরা আর একটি প্রমাণ চাই। রাসূল (দঃ) বললেন, আমি পথে মক্কাগামী একটি কাফেলার সাক্ষাৎ পাই এবং তিনি কাফেলার বিস্তারিত বিবরণসহ উটের সংখ্যা ও আগমনের সময়ও বলে দিলেন। রাসূল (সাঃ) সত্যই বলেছেন কিন্তু কাফেররা হঠকারিতা, কুফর ও সত্যকে অস্বীকার করার দরুণ উদভ্রান্ত রয়ে গেল। সকাল বেলায় জিবরাঈল এসে রাসূলকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পদ্ধতি ও সময় সূচী শিখিয়ে দিলেন। ইতিপূর্বে নামায শুধু সকাল বেলায় দু'রাকয়াত ও বিকেল বেলায় দু'রাকয়াত ছিলো।

কুরাইশরা সত্য অস্বীকার করতে থাকায় এ দিনগুলোতে তিনি মক্কায় আগমনকারী ব্যক্তিদের মাঝে দাওয়াতী তৎপরতা চালাতে লাগলেন। তিনি তাদের অবস্থান স্থলে মিলিত হয়ে দাওয়াত পেশ করতেন এবং তার সুন্দর ব্যাখ্যা দিতেন। আবু লাহাব তাঁর পিছনে তো লেগেই থাকতো। সে লোকদেরকে তাঁর থেকে ও তাঁর দাওয়াত থেকে সতর্ক থাকতে বলতো। একবার ইয়াসরিব থেকে আগত এক দলকে ইসলামের আহ্বান জানালে তাঁরা মনোযোগ দিয়ে শুনে এবং তাঁর অনুসরণ ও তাঁর প্রতি ঈমান আনতে ঐক্যবদ্ধ হয়। ইয়াসরীব বাসী ইহুদীদের কাছে শুনতো যে অদূর ভবিষ্যতে এক নবী প্রেরিত হবেন। তাঁর আবির্ভাবের যুগ নিকটে এসে গেছে। তাদেরকে যখন তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন,তাঁরা বুঝতে পারলো যে, তিনি সেই নবী, যার কথা ইহুদীরা বলেছে। তাঁরা সত্বর ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে এবং বলে ইহুদীরা যেন আমাদের অগ্রগামী না হয়। তাঁরা ছিল ৬ জন পরবর্তী বছরে ১২ জন আসে। তাদেরকে রাসূল (দঃ) মৌলিক শিক্ষা দেন। প্রত্যাবর্তনের সময় তাদের সাথে তিনি মুসআব বিন উমাইরকে কুরআন ও দ্বীনের বিধানাবলী শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠান।

মুসআব মদিনায় বিরাট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়ে ছিলো। এক বছর পর তিনি যখন মদীনায় আসেন, তখন তাঁর সাথে ৭২ জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা ছিল। রাসূল (দঃ) তাদের সাথে মিলিত হন এবং তাঁরা দ্বীনের সহযোগিতা ও এর প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অতঃপর তাঁরা মদীনায় ফিরে যান।

নতুন দাওয়াতের স্থান

মদীনা সত্য ও সত্যের ধারকদের আশ্রয়ে পরিণত হয়। মুসলমানরা সে দিকে হিজরত করতে লাগলেন। তবে কুরাইশরা ছিল মুসলমানদেরকে হিজরত করতে বাধা দেয়া ও প্রতিরোধ সৃষ্টি করার জন্য বদ্ধপরিকর। ফলে কতিপয় মুহাজির বিভিন্ন প্রকার শাস্তি ও নির্যাতনের শিকার হন। কুরাইশদের ভয়ে মুসলমানরা গোপনে হিজরত করতেন কিন্তু ওমারের (রাঃ) হিজরত ছিল ব্যতিক্রম। তাঁর হিজরত ছিলো সাহসিকতা, নির্ভীকতা ও চ্যালেঞ্জের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তরবারী উম্মোচিত করে এবং তীর বের করে কাবায় গিয়ে তাওয়াফ করেন। অতঃপর মুশরিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে বিধবা বা সন্তান-সন্ততিকে এতীম বানানোর ইচ্ছা করে, সে যেন আমার পিছু ধাওয়া করে। আমি আল্লার পথে হিজরত করছি। অতঃপর তিনি চলে গেলেন। কেউ পিছু ধাওয়া করার সাহস করেনি। আবু বকর সিদ্দীক রাসূলের নিকট হিজরতের অনুমতি চাইলে রাসূল (দঃ) তাঁকে বলেন, তাড়া হুড়া করো না। আশা করি আল্লাহ তোমার জন্য একজন সঙ্গী নির্ধারণ করবেন। অধিকাংশ মুসলমান ইতিপূর্বে হিজরত করেছেন। কুরাইশরা প্রায় উম্মাদ হয়ে গেল। মুহাম্মাদ (দঃ) এর দাওয়াতের উন্নতি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভয় ও আশংকা বোধ করলো। সবাই পরামর্শ করে রাসূল (সাঃ) কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলো। আবু জেহেল প্রস্তাব পেশ করলো যে, প্রত্যেক গোত্রের এক একজন নির্ভীক যুবককে তরবারী দেয়া হবে। এরা মুহাম্মাদকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে এক যোগে আক্রমণ করে হত্যা করবে। ফলে তার রক্ত বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। বনীহাশেম এর পর সব কাবিলার সাথে লড়াই করার হিম্মত করবে না। আল্লাহ তাঁর নবীকে তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করে দেন। তিনি আবু বাকরের সাথে হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন। রাতে আলীকে (রাঃ) নিজের বিছানায় শুয়ে থাকতে বললেন, যাতে লোকেরা মনে করে যে, রাসূল বাড়ীতেই আছেন, এবং আলীকে এ আশ্বাসও দিলেন যে, কোন ক্ষতি তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। ইতিমধ্যে কাফেররা বাড়ী ঘেরাও করে ফেলেছে। বিছানায় আলীকে দেখে তাঁরা নিশ্চিত হয় যে, রাসূল বাড়ীতে আছেন এবং হত্যা করার জন্য তাঁর বের হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলো। এ দিকে মুহাম্মাদ (দঃ) বের হয়ে সবার মাথার উপর বালু ছিটিয়ে দিলে আল্লাহ তাদের দৃষ্টি শক্তি ছিনিয়ে নেন। ফলে তাঁরা আঁচও করতে পারলো না যে, রাসূল (দঃ) বেরিয়ে গেলেন। অতঃপর আবু বকর (রাঃ) সহ প্রায় পাঁচ মাইল অতিক্রম করে "ছওর" গুহায় লুকিয়ে থাকেন। কুরাইশ যুবকেরা ভোর বেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করে অন্যদিকে আলীকে রাসূলের বিছানায় দেখতে পেয়ে হতাশ, বিস্মিত ও ক্ষেপে যায়। তাঁরা আলীকে জিজ্ঞাসা- বাদ ও মার ধর করে ও কোন হদিস বের করতে না পেয়ে চতুর্দিকে লোক জন পাঠলো। তাঁকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরে দিতে পারার জন্য ১০০ উটপুরস্কার ঘোষণা করা হলো। লোক জন চারি দিকে হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগলো। একদল তো তাঁর অনুসন্ধানে গুহার দ্বার প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এমন কি তাঁরা যদি একটু ঝুঁকে গুহার ভিতর তাকায়, তাহলে, তাঁদের দেখতে পাই। এমন শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে রাসূলের ব্যাপারে আবু বাকরের (রাঃ) চিন্তা ও উদ্বেগ বেড়ে যায়। রাসূল (দঃ) বলেন, لا تحزن إن الله معنا চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অনুসন্ধানকারীরা তাদের সন্ধান আর পেল না।

গুহায় তাঁরা তিন দিন অবস্থান করে মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন। পথ ছিল সুদীর্ঘ ও দুর্গম। সূর্য ছিল অতীব উত্তপ্ত। দ্বিতীয় দিন বিকেলবেলায় এক তাঁবুর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, যেখানে উম্মে মা'বাদ নামে এক মহিলা বাস করতো। রাসূল তাঁর কাছে খাবার ও পানি চাইলে সে কিছুই দিতে পারেনি। কিন্তু একটি স্ত্রী

ছাগল এতই দুর্বল ছিল যে, ঘাস খেতে যেতে পারেনি। এক ফোঁটা দুধ তার স্তনে ছিল না। রাসূল (সাঃ) স্তনের উপর তাঁর হাত মুবারক বুলিয়ে দিয়ে দুধ দোহন করে এক বড় পাত্র ভরে নেন। উম্মে মা'বাদ এ অলৌকিক ঘটনা দেখে বিস্মিত ও বিহবল হয়ে পড়ে। সবাই পান করেন এবং ক্ষুধা নিবারণ করেন। অতঃপর আর এক পাত্র ভরে উম্মে মা'বাদকে দিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেন।

মদীনাবাসী এদিকে তাঁর শুভাগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। প্রতি দিন তাঁরা মদীনার বাহিরে প্রতীক্ষায় থাকতেন। যে দিন তাঁর আগমন হয়, সে দিন সবাই পুলকিত হৃদয়ে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানান। তিনি মদীনার নিকটে কুবায় যাত্রা বিরতি করেন এবং সেখানে চার দিন অবস্থান করেন। তিনি এ সময়ে কুবা মসজি- দের ভিত্তি স্থাপন করেন। আর এটাই ইসলামের প্রথম মসজিদ। ৫ম দিনে তিনি মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন। অনেক আনসারী সাহাবী রাসূল (সাঃ) কে অতিথি হিসাবে বরণ করার চেষ্টা করেন এবং তার উটের লাগাম ধরেন। রাসূল (সাঃ) তাদের শুকরিয়া আদায় করে বলেন, উট ছেড়ে দাও, সে নির্দেশ প্রাপ্ত। আল্লাহর নির্দেশ যেখানে হল সেখানে গিয়ে উট বসে যায়। তিনি অবতরণ না করতেই উঠে সে অগ্রভাগে কিছু পথ চলে আবার পিছনে এসে প্রথম স্থানে বসে যায়। সেটাই ছিল মসজিদে নববীর স্থান। তিনি আবু আইয়ুব আনসারীর অতিথি হন। আলী বিন আবু তালিব নবীর (সাঃ) হিজরতের পর তিন দিন মক্কায় অবস্থান করেন। অতঃপর কুবায় রাসূলের সাথে মিলিত হন।

রাসূল (সাঃ) মদীনায়

উট যেখানে বসে গিয়েছিলো জায়গাটি প্রকৃত মালিক থেকে কেনার পর সেখানে রাসূল (সাঃ) মসজিদ নির্মাণ করেন। মুহাজির ও আনসারীদের মধ্যে পবিত্র ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। প্রত্যেক আনসারীর জন্য একজন মুহাজির ভাই দেয়া হয় যে, তাঁর ধন-সম্পদের অংশীদার হত। মুহাজির ও আনসারী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন। ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক গভীর ও সুদৃঢ় হয়। মদীনার ইয়াহুদীদের সাথে কুরাইশদের সম্পর্ক ছিল। তাঁরা মুসলমানদের মাঝে বিশৃংখলা নৈরাজ্য ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টির পায়তারা চালাতো। কুরাইশরা মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার হুমকিও প্রদর্শন করতো। এ ভাবে বিপদ ও আশংকা মুসলমানদেরকে ভিতরে ও বাইরে ঘিরে ছিল। পরিস্থিতি এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, সাহাবায়ে কেরাম রাতে ঘুমাবার সময় অস্ত্র রাখতেন।

বদরের যুদ্ধ

এমন বিপজ্জনক ও বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'য়ালা সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেন। রাসূল (সাঃ) শত্রুদের তৎপরতা জানার লক্ষ্যে সামরিক মিশন চালানো আরম্ভ করেন। শত্রুদের বাণিজ্যিক কাফেলার পিছু নেয়া ও প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে লাগলেন যাতে, তাঁরা মুসলমানদের শক্তির কথা উপলব্ধি করে শান্তি ও সন্ধি প্রক্রিয়ায় এসে ইসলাম প্রচারের স্বাধীনতায় ও তা বাস্তবায়নে কোন ধরণের বিঘ্ন না ঘটায়। কতিপয় গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তি ও দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। এক বার তিনি কুরাইশের এক বাণিজ্যিক কাফেলার পথ রুদ্ধ করা কল্পে তিন শত তের জন সাথী নিয়ে বের হন। সাথে ছিলো২টি ঘোড়া ৭০টি উট। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশী কাফেলায় উট ছিলো ১০০০ এবং ৪০ জন লোক। আবু সুফিয়ান মুসলমানদের বের হবার কথা শুনে জরুরী ভিত্তিতে এক লোক পাঠিয়ে মক্কায় খবর দেয় এবং সাহায্যের আবেদন জানিয়ে রাস্তা পরিবর্তন করে অন্য পথ ধরে। ফলে মুসলমানরা তাদেরকে ধরতে পারেন নি। অন্য দিকে কুরাইশরা এ খবর পেয়ে ১০০০ যোদ্ধা নিয়ে বের হয়ে পড়ে কাফেলার সাহায্যের জন্য। আবু সুফিয়ান কাফেলার নিরাপদে চলে আসার খবর জানিয়ে তাদেরকে মক্কায় ফিরে যাবার অনুরোধ জানায়। কিন্তু আবু জেহেল ফিরে যেতে অস্বীকার করে এবং যোদ্ধারা বদর নামক স্থান পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত রাখে। কুরাইশের বের হবার কথা জেনে রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামদের সাথে পরামর্শ করলে সবাই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার রায় দেন।

ছাগল এতই দুর্বল ছিল যে, ঘাস খেতে যেতে পারেনি। এক ফোঁটা দুধ তার স্তনে ছিল না। রাসূল (সাঃ) স্তনের উপর তাঁর হাত মুবারক বুলিয়ে নিয়ে দুধ দোহন করে এক বড় পাত্র ভরে নেন। উম্মে মা'বাদ এ অলৌকিক ঘটনা দেখে বিস্মিত ও বিহবল হয়ে পড়ে। সবাই পান করেন এবং ক্ষুধা নিবারণ করেন। অতঃপর আর এক পাত্র ভরে উম্মে মা'বাদকে দিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেন।

মদীনাবাসী এদিকে তাঁর শুভাগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। প্রতি দিন তাঁরা মদীনার বাইরে প্রতীক্ষায় থাকতেন। যে দিন তাঁর আগমন হয়, সে দিন সবাই পুলকিত হৃদয়ে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানান। তিনি মদীনার নিকটে কুবায় যাত্রা বিরতি করেন এবং সেখানে চার দিন অবস্থান করেন। তিনি এ সময়ে কুবা মসজি- দের ভিত্তি স্থাপন করেন। আর এটাই ইসলামের প্রথম মসজিদ। ৫ম দিনে তিনি মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন। অনেক আনসারী সাহাবী রাসূল (সাঃ) কে অতিথি হিসাবে বরণ করার চেষ্টা করেন এবং তার উটের লাগাম ধরেন। রাসূল (সাঃ) তাদের শুকরিয়া আদায় করে বলেন, উট ছেড়ে দাও, সে নির্দেশ প্রাপ্ত। আল্লাহর নির্দেশ যেখানে হল সেখানে গিয়ে উট বসে যায়। তিনি অবতরণ না করতেই উঠে সে অগ্রভাগে কিছু পথ চলে আবার পিছনে এসে প্রথম স্থানে বসে যায়। সেটাই ছিল মসজিদে নববীর স্থান। তিনি আবু আইয়্যুব আনসারীর অতিথি হন। আলী বিন আবু তালিব নবীর (সাঃ) হিজরতের পর তিন দিন মক্কায় অবস্থান করেন। অতঃপর কুবায় রাসূলের সাথে মিলিত হন।

রাসূল (সাঃ) মদীনায়

উট যেখানে বসে গিয়েছিলো জায়গাটি প্রকৃত মালিক থেকে কেনার পর সেখানে রাসূল (সাঃ) মসজিদ নির্মাণ করেন। মুহাজির ও আনসারীদের মধ্যে পবিত্র ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। প্রত্যেক আনসারীর জন্য একজন মুহাজির ভাই দেয়া হয় যে, তাঁর ধন-সম্পদের অংশীদার হত। মুহাজির ও আনসারী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন। ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক গভীর ও সুদৃঢ় হয়। মদীনার ইয়াহুদীদের সাথে কুরাইশদের সম্পর্ক ছিল। তাঁরা মুসলমানদের মাঝে বিশৃংখলা নৈরাজ্য ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টির পায়তারা চালাতো। কুরাইশরা মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার হুমকিও প্রদর্শন করতো। এ ভাবে বিপদ ও আশংকা মুসলমানদেরকে ভিতরে ও বাইরে ঘিরে ছিল। পরিস্থিতি এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, সাহাবায়ে কেরাম রাতে ঘুমাবার সময় অস্ত্র রাখতেন।

বদরের যুদ্ধ

এমন বিপজ্জনক ও বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে আল্লাহ ত'য়ালা সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেন। রাসূল (সাঃ) শত্রুদের তৎপরতা জানার লক্ষ্যে সামরিক মিশন চালানো আরম্ভ করেন। শত্রুদের বাণিজ্যিক কাফেলার পিছু নেয়া ও প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে লাগলেন যাতে, তাঁরা মুসলমানদের শক্তির কথা উপলব্ধি করে শান্তি ও সন্ধি প্রক্রিয়ায় এসে ইসলাম প্রচারের স্বাধীনতায় ও তা বাস্তবায়নে কোন ধরণের বিঘ্ন না ঘটায়। কতিপয় গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তি ও দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। এক বার তিনি কুরাইশের এক বাণিজ্যিক কাফেলার পথ রুদ্ধ করা কল্পে তিন শত তের জন সাথী নিয়ে বের হন। সাথে ছিলো২টি ঘোড়া ৭০টি উট। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশী কাফেলায় উট ছিলো ১০০০ এবং ৪০ জন লোক। আবু সুফিয়ান মুসলমানদের বের হবার কথা শুনে জরুরী ভিত্তিতে এক লোক পাঠিয়ে মক্কায় খবর দেয় এবং সাহায্যের আবেদন জানিয়ে রাস্তা পরিবর্তন করে অন্য পথ ধরে। ফলে মুসলমানরা তাদেরকে ধরতে পারেন নি। অন্য দিকে কুরাইশরা এ খবর পেয়ে ১০০০ যোদ্ধা নিয়ে বের হয়ে পড়ে কাফেলার সাহায্যের জন্য। আবু সুফিয়ান কাফেলার নিরাপদে চলে আসার খবর জানিয়ে তাদেরকে মক্কায় ফিরে যাবার অনুরোধ জানায়। কিন্তু আবু জেহেল ফিরে যেতে অস্বীকার করে এবং যোদ্ধারা বদর নামক স্থান পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত রাখে। কুরাইশের বের হবার কথা জেনে রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামদের সাথে পরামর্শ করলে সবাই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার রায় দেন।

হিজরী ২য় সনে ১৭ই রমযান শুক্রবার ভোরবেলায় উভয়দল মুখোমুখি হয় এবং তুমুল যুদ্ধ চলে। মুসলমানরা বিপুল ভাবে জয়লাভ করেন। তাদের মধ্যে ১৪জন শাহাদতের অমিয় সুধা পানকরেন।৭০জন কাফের নিহত এবং ৭০জন গ্রেফতার হয়। যুদ্ধকালীন নবী কন্যা রুকাইয়া মৃত্যু বরণ করেন। হজরত ওসমান (রাঃ) রাসূলের নির্দেশে তাঁর রোগাক্রান্ত স্ত্রীর পরিচর্যা ও দেখা-শুনার জন্য মদীনায় থেকে যাওয়ার ফলে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। যুদ্ধের পরে রাসূল (দঃ) তাঁর আর এক মেয়ে উম্মে কুলসুমকে ওসমানের সাথে বিয়ে দেন। তাই তাঁর উপাধি ছিল "যিন্নূরাইন"। কারণ তিনি রাসূলের দু'কন্যা বিয়ে করেন। যুদ্ধ শেষে মুসলমানরা আল্লার সাহায্যে উল্লসিত ও আনন্দিত হয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। সাথে ছিল যুদ্ধ বন্দী ও মালে গনিমত। যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে কিছু লোককে পণের বিনিময়ে, আবার অনেককে এমনিতে মুক্তি দেয়া হয়। তাদের মধ্যে কিছু লোকের মুক্তি পণ ছিলো মুসলমানদের ১০জন ছেলেকে লেখা-পড়া শিখিয়ে দেয়া।

ওহুদের যুদ্ধ

বদর যুদ্ধের পর মুসলমান ও মক্কার কাফেদের মধ্যে অন্যান্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ওহুদ যুদ্ধ হচ্ছে তম্মধ্যে দ্বিতীয়। এতে মুশরিকরা জয়লাভ করে। কারণ কিছু সংখ্যক মুসলমান রাসূলের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেন নি। ফলে সুপরিকল্পিত রণকৌশলকে ব্যাহত করে। যুদ্ধে কাফেরদের সংখ্যা ছিল ৩০০০। পক্ষান্তরে মুসলমান ছিলেন ৭০০ জন। এ যুদ্ধের পর মদীনার কিছু ইহুদী মক্কায় গিয়ে মক্কাবাসীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উস্কানি দেয় এবং নিজেদের সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। ফলে কাফেররা ইতিবাচক সাড়া দেয়। অতঃপর ইহুদীরা অন্যান্য গোত্রসমূহকে উস্কানি দিলে তারাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়ার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে। মুশরিকরা প্রত্যেক এলাকা থেকে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা দেয়। ১০, ০০০ যোদ্ধা সমবেত হল। নবী (দঃ) শত্রুপক্ষের তৎপরতার কথা জেনে সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। সালমান ফারসী মদীনার যে দিকে পাহাড় নেই, সে দিকে পরিখা খননের পরামর্শ দেন। সব মুসলমান উদ্যম ও প্রেরণা সহকারে পরিখা খননে অংশ গ্রহন করেন এবং কাজ সত্বর সমাপ্ত হয়। মুশরিকরা এক মাস পর্যন্ত অবস্থান করেও পরিখা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। অবশেষে আল্লাহতা'য়ালা প্রচন্ড বাতাস প্রেরণ করে কাফেরদের তাঁবু সমূহ উপড়ে ফেলেন। তাঁরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং শীঘ্রই নিজ নিজ শহরে ফিরে যায়।

মক্কা বিজয়

হিজরি ৮ম সনে রাসূল (দঃ) মক্কা অভিযান চালানোর ইচ্ছা করেন। ১০ই রমযান ১০০০০ সদস্যের বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কায় যুদ্ধ ছাড়াই প্রবেশ করেন। কুরাইশরা আত্মসমর্পণ করে। আল্লাহ তা'য়ালা মুসালমানদেরকে বিজয় দান করেন। নবী (দঃ) কাবা শরীফ তাওয়াফ করে কাবার অভ্যন্তরে দু'রাকায়াত নামায আদায় করেন। অতঃপর ভেতরে রাখা সব মূর্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করেন। কাবাশরীফের দরজায় দাঁড়িয়ে মসজিদে হারামে কাতার বদ্ধ ভাবে অপেক্ষারত সমবেত কুরাইশদেরকে বলেন, হে কুরাইশরা! তোমাদের সাথে কি আচরণ করবো বলে মনে করো। তাঁরা বলে, ভালো আচরণ, দয়াবান ভাই, দয়াবান ভাই এর পুত্র। তিনি বলেন, যাও তোমরা সবাই মুক্ত। রাসূল (দঃ) ক্ষমার উজ্জ্বল ও বৃহত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করেন। তাঁরাই সেই লোক যারা তাঁর সাহাবাদের উপর চালিয়ে ছিল অত্যাচারের স্টীম রোলার, খুন করেছে অনেককে, কষ্ট দিয়েছে স্বয়ং তাঁকে এবং নিজের মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করেছে। মক্কা বিজয়ের পর লোক জন দলে দলে আল্লাহর দ্বীনের ছায়াতলে সমবেত হয়। হিজরি ১০ম সনে রাসূল (দঃ) হজ্জ্ব করেন। এটা তাঁর এক মাত্র হজ্জ্ব ছিল। তাঁর সাথে এক লাখ লোক হজ্জ্ব করেন। হজ্জ্ব পালন শেষে তিনি মদীনায় প্রত্যাগমন করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু

প্রায় আড়াই মাস পর তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। দৈনন্দিন রোগ বেড়ে যায়। তীব্রভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে ইমামতি করতে অক্ষম হয়ে পড়লে আবু বাকার (রাঃ) কে ইমামতি করতে বলেন। হিজরি ১১সনে ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার ৬৩ বছর বয়সে রাসূল (দঃ) ইন্তেকাল করেন। এ খবর শুনে সাহাবায়ে কেরাম প্রায় জ্ঞান ও স্বস্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ খবর বিশ্বাস করতে পার ছিলেন না। এহেন সময় আবু বাকার সিদ্দীক (রাঃ) এক ভাষণে লোক জনকে শান্ত করেন। তিনি বলেন, রাসূল এক জন মানুষ ছিলেন। যিনি মৃত্যু বরণ করেন, যেমন অন্যা- না মানুষ মৃত্যু বরন করে। মানুষ শান্ত হয়ে যায়। রাসূলের গোসল দেয়া, কাফন পরানো ও দাফন করা সম্পূর্ণ হলো। অতঃপর মুসলমানরা আবু বাকারকে (রাঃ) নিজেদের খলিফা নির্বাচন করেন। তিনি ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীন- দের মধ্যে প্রথম। রাসূল (দঃ) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে চল্লিশ বছর ও পরে তের বছর মক্কায় এবং দশ বছর মদীনায় অতিবাহিত করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর।

তাঁর চরিত্র

তিনি সর্বাপেক্ষা নির্ভীক ও সাহসী ছিলেন। আলী বিন আবু তালিব বলেন, যখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হতো, এক দল অন্য দলের মুখোমুখি যুদ্ধ করতো, আমরা রাসূলকে আড়াল হিসাবে রাখতাম। তিনি সর্বাপেক্ষা দানবীর ছিলেন। কখনো কোন জিনিস চাওয়া হলে তিনি না' করেন নি। তিনি সর্বাপেক্ষা ধৈর্যশীল ছিলেন। নিজের জন্য কোন প্রতিশোধ নেন নি। নিজের স্বার্থের জন্য কখনো রাগান্বিত হন নি। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর হুকুম-বিধান লংঘন করা হলে আল্লাহর নিমিত্তই প্রতিশোধ নিয়েছেন। অধিকারের ব্যাপারে তাঁর নিকটে আত্মীয়-অনাত্মীয়, দুর্বল, সবল সমান ছিলো। তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, তাকওয়া ছাড়া আল্লাহর কাছে কেউ কারো চাইতে শ্রেয় নয়। সব মানুষ সমান ও সমকক্ষ। পূর্ববর্তী জাতিগুলো এ জন্য ধ্বংস হয়েছে যে, কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করলে ছেড়ে দিতো, আর কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে শাস্তি দিতো। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ চুরি করে, আমি তাঁর হাত কর্তন করবো। কখনো কোন খাবারের দোষ বর্ণনা করেন নি। রুচি সম্মত হলে আহার করতেন। অন্যথায় বর্জন করতেন। কোন কোন সময় এক মাস দু'মাস পর্যন্ত তাঁর বাড়ীতে আগুন প্রজ্জ্বলিত হতো না। তিনি ও তাঁর পরিবার শুধু খেজুর ও পানি আহার করেছেন। ক্ষুধার তীব্র জ্বালা প্রশমিত করার জন্য মাঝে মাঝে উদর মুবারকে প্রস্তর বেঁধে রাখতেন। অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যেতেন। তিনি জুতা সিলাই করতেন। কাপড়ে তালি লাগাতেন। গৃহ কর্মে তাঁর পরিবারবর্গের সহযোগিতা করতেন। তিনি অতি নম্র ছিলেন। ধনী-গরীব, সম্ভ্রান্ত-অ সম্ভ্রান্ত সবার দাওয়াত গ্রহণ করতেন। ভাল বাসতেন গরীব মিসকীনকে প্রচুর। জানাযায় হাজির হতেন। পিড়িত লোকদের দেখতে যেতেন। কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে দারিদ্র্যের জন্য ঘৃণা করতেন না। কোন রাজা বা শাসককে তাঁর রাজত্ব ও যশ-ঐশ্বর্যের কারনে ভয় করতেন না। ঘোড়া, উট, গাধা ও খচ্চরের উপর আরোহণ করতেন। সর্বাপেক্ষা সুদর্শন ছিলেন। সব চাইতে বেশী স্নিগ্ধ হাসতেন। অথচ দুঃখ বিপদ অনবরত আসতে থাকতো। সুগন্ধ ভাল বাসতেন। দুর্গন্ধ ঘৃণা করতেন। আল্লাহ পাক চারিত্রিক উৎকর্ষ ও সুন্দর কর্মের অনুপম সন্নিবেশ ঘটিয়েছিলেন তাঁর মধ্যে। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে এমন জ্ঞান দান করেছিলেন যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অন্য কাউকে দান করা হয়নি।

তিনি ছিলেন নিরক্ষর। জানতেন না লেখা-পড়া। মানুষের মধ্যে কেউ তাঁর শিক্ষক ছিলো না। আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে আসেন মহান গ্রন্থ আল কুরআন, যার সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ পাক বলেন, 'বলুন, যদি মানুষ ও জ্বীন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করার জন্য জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তারা কখনো এর অনুরূপ রচনা করতে পারবে না'। (ইসরাঃ৮৮) রাসূলের (সাঃ) নিরক্ষর হওয়াটাই ছিল মিথ্যা

অপবাদকারীদের সব অহেতুক প্রলাপের অকাট্য, অপ্রতিরোধ্য ও অখন্ডনীয় উত্তর। যাতে একথা বলতে না পারে যে, তিনি স্বহস্তে লিখেছেন বা অন্যের কাছে শিখেছেন বা অন্য সূত্র থেকে পাঠ করে সংগ্রহ করেছেন।

তাঁর কতিপয় মু'জেজা

তাঁর সব চাইতে বড় মু'জেজা কুরআন, যা আরবি সাহিত্যের বড় বড় পন্ডিত ও সাহিত্যিকদের অপারগ করে দিয়েছে। এবং সবাইকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছে যে, কুরআনের অনুরূপ ১০টি সূরা অথবা ১টি সূরা বা অন্ততঃ পক্ষে ১টি আয়াত রচনা করে আনো। মুশরিকরা নিজেদের অক্ষমতার কথা স্বীকার করেছে। মুশরিকরা একবার তাঁকে একটি নিদর্শন দেখানোর কথা বললে তিনি চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়াকে দেখান। চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল। অনেক বার তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি উৎসারিত হয়েছে। তাঁর হাতে পাথর তাসবীহ পাঠ করেছে। অতঃপর যথাক্রমে আবু বাকার,ওমার ও উসমানের হাতেও তাসবীহ পাঠ করেছে। খাবার আহার করাকালীন তাঁর কাছে তাসবীহ পাঠ করতো এবং এর ধ্বনি সাহাবায়ে কেরাম শুনতে পেতেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির রাতসমূহে পাথর ও গাছ পালা সালাম করেছে। এক ইহুদী নারী রাসূলকে বিষপানে হত্যা করার জন্য ছাগলের এক পা খেতে দেয় যা বিষ মাখা ছিলো। সে পা রাসূলের সাথে কথা বলে। একবার এক বেদুইন তাঁকে একটি নিদর্শন দেখাতে বলে। তিনি একটি গাছকে নির্দেশ দিলে রাসূলের কাছে আসে। আবার নির্দেশ দিলে যথাস্থানে চলে যায়। এক দুধবিহীন ছাগলের স্তনে হাত মুবারাক স্পর্শ করায় দুগ্ধ আসে। তিনি তা দোহন করে নিজেও পান করেন এবং আবু বাকারকেও পান করতে দেন। আলী বিন আবুতালিবের ব্যথিত চোখে তিনি থুথু দিলে সঙ্গে সঙ্গে তা ভাল হয়ে যায়। এক সাহাবী পায়ের আঘাতে আহত হওয়ার পর রাসূল (দঃ) হাত বুলিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়ে যায়। আনাস বিন মালিকের জন্য সুদীর্ঘায়ু, স্বচ্ছলতা এবং সন্তান-সন্ততি বেশী হওয়ার জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ তাঁর এসব জিনিসে এত বরকত দান করেন যে,তাঁর স্ত্রীসমূহের ঔরসে ১২০জন সন্তান জন্ম নেয়, তাঁর খেজুর গাছে বছরে দু'বার ফল ধরত ,অথচ এ কথা সুবিদিত যে খেজুর গাছে বছরে এক বারই ফল আসে। আর তিনি ১২০ বছর বয়স পেয়ে ছিলেন। এক সময় রাসূল (দঃ) মিম্বারে ছিলেন,এহেন অবস্থায় এক লোক এসে অনাবৃষ্টি ও খরা অবসানের জন্য দোয়ার আরজ করল। রাসূল (দঃ) দোয়া করলেন। আকাশে কোন মেঘ ছিল না। হঠাৎ পর্বত সম মেঘ ছেয়ে গেল। মুষল ধারা বৃষ্টি হলো পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত। একই ব্যক্তি অতিবৃষ্টির অবসান হওয়ার জন্য দোয়ার আবেদন করলো। রাসূল (দঃ) দোয়া করলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ সূর্যের তাপে বের হয়ে গেলো। একটি ছাগল ও প্রায় তিন কিলো গ্রাম গম দিয়ে এক হাজার পরিখা যুদ্ধের মুজাহিদগণকে পেট ভরে খাওয়ান। সবাই খাওয়ার পরেও খাবার সামান্যও কম হয়নি। অনুরূপ ভাবে অল্প খেজুর দিয়ে পরিখা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের খাওয়ান, যে খেজুর বাশির বিন সা'দের কন্যা তাঁর পিতা ও মামার জন্য এনে ছিলো এবং আবু হুরাইরার স্বল্প খাদ্য দ্বারা পরিখা যুদ্ধের মুজাহীদগণকে পেট ভরে খাওয়ান। তিনি এক শ'জন কুরাইশী ব্যক্তি,যারা তাঁকে হত্যা করার জন্য অপেক্ষা করতে ছিলো,এর মুখের দিকে মাটি ছিটিয়ে দিলে কেউ তাঁকে দেখতে সক্ষম হয়নি। তিনি তাদের নাকের ডগায় চলে গেলেন। সুরাকা বিন মালেক তাঁকে হত্যা করার জন্যে পিছু ধাওয়া করে আর রাসূল দোয়া করলে তাঁর পা যমিনে ধ্বসে যায়।

أحكام الأطعمة

খাদ্য সম্পর্কীয় বিধান

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে পাক ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। আর নাপাক অপবিত্র খাদ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তাই তিনি বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ (البقرة ١٧٢

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ, যেসব পবিত্র দ্রব্যাদি আমি তোমাদের দান করেছি তা অসংকোচে খাও"। (২: ১৭২) বস্তুতঃ হারাম বলে ঘোষিত বস্তু ব্যতীত সব খাদ্যই আমাদের জন্য হালাল। আল্লাহতা'য়ালা তাঁর মুমিন বান্দাদের জন্য পাক ও পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করে দিয়েছেন, যাতে তাঁরা তদ্দ্বারা উপকৃত হতে পারে। সুতরাং আল্লাহর নেয়ামত দ্বারা কোন অন্যায় ও শরীয়ত বিরোধী কাজে সাহায্য গ্রহণ করা বৈধ নয়।। খাদ্য ও পানীয় বস্তুর মধ্যে যা হারাম, তার সুস্পষ্ট বর্ণনা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (الأنعام ١١٩)

অর্থাৎ, "যেসব জিনিসের ব্যবহার আল্লাহ তা'য়ালা হারাম করে দিয়েছেন, তা তিনি তোমাদেরকে বিস্তারিত বলে দিয়েছেন। নিতান্ত ঠেকার সময় ছাড়া"। (৬ : ১১৯) সুতরাং যা হারাম বলে ঘোষিত হয়নি, তা হালাল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন,

((إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ، فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا، وَحَدَّدَ حُدُوْداً فَلاَ تَعْتَدُوْهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ، فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ، فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا)) رواه الطبراني.

অর্থাৎ, "আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের প্রতি কতগুলো বিষয় ফরয করেছেন, তা নষ্ট করনা। কতগুলো সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা লঙ্ঘন করনা। কতকগুলো জিনিস হারাম (অবশ্য পরিত্যাজ্য) করেছেন, সেগুলোর মধ্যে লিপ্ত হয়ে পাপ করো না। আর তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কতগুকলো জিনিস সম্পর্কে ইচ্ছা করেই নীরব রয়েছেন, সেগুলো নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না" (তাবরানী)

প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্য, পানীয় ও পোশাকাদি, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক হারাম বলে বর্ণিত হয়নি, সেগুলিকে হারাম বলা যাবে না। মূলতঃ প্রত্যেক পবিত্র ও ক্ষতিবিহীন খাদ্য হালাল। তবে অপবিত্র খাদ্য, যেমন মৃত, রক্ত, মাদকদ্রব্য, ধূম্র-পান এবং এমন জিনিস, যার সাথে অপবিত্র কোন কিছু মিশে গেছে, এসবই হারাম। কেননা, এগুলি ক্ষতিকর। আর মৃত বলতে, শরীয়তী পদ্ধতিতে জবাই করা ব্যতীতই যার প্রাণ নাশ করা হয়েছে তাকে বুঝানো হয়েছে। আর রক্ত বলতে, যবেহ কৃত পশু থেকে নির্গত প্রবহমান রক্ত বুঝায়। তবে যবেহ করার পর মাংসে এবং রগসমূহে অবশিষ্ট রক্ত বৈধ।

যে সমস্ত খাদ্য হালাল, তা দু'প্রকারের। যথা- (১) পশুজাত (২) সমূহ উদ্ভিদ। এ সবের মধ্যে যাতে কোন প্রকারের ক্ষতি নেই, সেগুলি সবই হালাল। আর পশুজাত দু'প্রকারের। এক প্রকার জীব-জানোয়ার যারা স্থলে বসবাস করে। আর এক প্রকার, যারা সমুদ্রে বসবাস করে। যে সমস্ত পশু সমুদ্রে বাস করে, সে সমস্ত পশুই হালাল, তাতে জবাই করার শর্ত আরোপিত হবে না। কারণ, সমুদ্রের মৃত হালাল। আর স্থলে বসবাসকারী পশুর মধ্যে যে কয়েক প্রকার পশুকে ইসলাম হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে, সেগুলি ব্যতীত সবই হালাল। যেমন,

১। পান্তুগাধা।
২। শুঁইসাপ ব্যতীত এমন দাঁত বিশিষ্ট জানোয়ার, যারা দাঁত দিয়েই ছিঁড়ে খায়।
৩। সব রকমের পাখিই হালাল, তবে যে পাখি থাবা দিয়ে আক্রমণ করে শিকার করে, সে পাখি হারাম। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيُوْرِ))

رواه مسلم

অর্থাৎ,"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম প্রত্যেক দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র পশু এবং থাবা দিয়ে আক্রমণকারী পাখি খেতে নিষেধ করেছেন"।(মুসলিম) অনুরূপ যে সব পাখিরা পচা-গলা ও নোংরাজাতীয় জিনিস খায়, সে সব পাখিও হারাম। যেমন, শকুনি, বাজপাখি এবং কাক। নোংরা আবর্জনা আহার করার কারণেই এগুলি হারাম বলে ঘোষিত হয়েছে। ঘৃণিত জীব-জন্তুও হারাম। যেমন, সাপ, ইঁন্দুর ও যমীনে বিচরণশীল কীট-পতঙ্গ।

উপরোল্লেখিত পশু-পাখি ব্যতীত সবই হালাল। যেমন, ঘোড়া, গৃহপালিত পশু, মুরগী, জংলী গাধা, হরিণ, উট পাখি এবং খরগোশ ইত্যাদি। তবে "জাল্লালাহ্" এসবের ব্যতিক্রম। আর "জাল্লালাহ্" ঐ পশুকে বলা হয়, যার অধিকাংশ চারাই হচ্ছে নোংরাজাতীয় জিনিস ও অপবিত্র মল। এই ধরনের পশুকে তিন দিন পর্যন্ত বদ্ধ রেখে পবিত্র খাদ্য দিতে হবে। তবেই তাকে খাওয়া বৈধ হবে। অন্যথায় তা হারাম হবে। পিয়াজ, রশুন সহ অতি দুর্গন্ধময় জিনিস আহার করা অপছন্দনীয়। বিশেষ করে মসজিদে আসার সময়। যদি কেউ নিরুপায় হয়ে হারাম কৃত বস্তু আহার করতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ আহার না করলে প্রাণ নাশের আশংকা থাকে, তাহলে ততটুকু পরিমাণ তা থেকে আহার করা তার জন্য বৈধ, যাতে তার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। তবে বিষ কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করা যাবে না। যদি কেউ ঘেরাবিহীন বাগানের কোন গাছের ফল গাছের মধ্যে অথবা পড়ে থাকা অবস্থায় পায়, যার কোন রক্ষক নেই,সে ফল আহার করা তার জন্য জায়েয। তবে বয়ে নিয়ে যাওয়া ও গাছে আহরণ করে, বা কোন কিছু দিয়ে ফল পাড়া তার জন্য বৈধ নয়। অনুরূপ বিনা প্রয়োজনে গচ্ছিত ফলও সে খেতে পারে না।

জবাই করার বিধান

যেহেতু স্থলচর প্রাণী বৈধ হওয়ার শর্তই হলো, শরীয়তী পদ্ধতিতে তা জবাই করা, তাই জবাই ও তৎসংক্রান্ত বিধান সম্পর্কে জানা অত্যাবশ্যক। জবাই বলতে স্থলচর বৈধ পশুর কণ্ঠনালী ও খাদ্যনালীকে কর্তন করা বুঝায়। যে জীব-জন্তু যবেহ করা সম্ভব, তা বিনা জবাইয়ে হালাল হবে না। কারণ, বিনা জবাইয়ের পশু মৃত বলে গণ্য হয়।

জবাইয়ের শর্তাবলী

১। জবাইকারীর জবাইয়ের উপযুক্ত হওয়া। অর্থাৎ, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন ও আসমানী দ্বীনে বিশ্বাসী হতে হবে। তাতে সে মুসলমান হোক অথবা আহলে কিতাব হোক। সুতরাং কোন পাগল, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি ও ছোট শিশুর জবাই করা পশু হালাল হবে না। কেননা, অজ্ঞতার কারণে তাদের দ্বারায় জবাইয়ের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অর্জিত হয় না। কোন মূর্তিপূজক, কাফের, অথবা অগ্নিপূজক, কিংবা কবরপূজক কর্তৃক জবাই করা পশুও বৈধ নয়।
২। অস্ত্রের দ্বারা জবাই করা। সুতরাং এমন সব ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করা যায়, যে ধারে রক্ত প্রবাহিত হয়,

তা সে লোহা হোক, অথবা পাথর হোক, অথবা অন্য কোন কিছু হোক। তবে হাড় ও নখ দিয়ে জবাই করা জায়েয নয়।

৩। কণ্ঠনালী কর্তন করা। অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস যাতায়াত নালী, খাদ্যনালী এবং ঘাড়ের উভয় রগের কোন এক রগ কর্তন করা।

এই স্থানটির মধ্যে জবাইকে সীমাবদ্ধ করা এবং বিশেষভাবে এই জিনিসগুলি কর্তন করতে বলার মধ্যে কৌশল বা হিকমত হলো, যাতে রক্ত প্রবাহিত হয়। কারণ এই স্থানটি অনেকগুলি রগের মূল কেন্দ্র। তাছাড়া এতে তাড়াতাড়ি প্রাণ নাশ হয়, যাতে গোশত হয় সুস্বাদু ও পশুর কষ্ট হয় কম। উপায় না থাকার কারণে যে পশুর উল্লেখিত স্থানে যবেহ করতে অক্ষম হবে, যেমন শিকার ইত্যাদি, সে পশুর যে কোন স্থানে আহত বা জখম করাই তার যবেহ বলে পরিগণিত হবে। আর যে পশু কোন দুর্ঘটনায় আহত হবে, যেমন গলায় ফাঁস পড়ে যাওয়া, উপর হতে কোন ভারী জিনিসের আঘাত লাগা, কোন সংঘর্ষে আহত হওয়া, কিংবা কোন হিংস্র জন্তুর আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি পশুগুলি জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেলে, জবাই করে তা খাওয়া হালাল।

৪। জবাইকারীর জবাই করার সময় "বিসমিল্লাহ" বলা। " বিসমিল্লাহ"এর সাথে " আল্লাহু আকবার" বলাও সুন্নাত।

জবাই করার আদব

১। ভোঁতা কোন অস্ত্র দিয়ে জবাই করা অপছন্দনীয়।

২। পশুকে দেখিয়ে অস্ত্রে ধার দেওয়া ঠিক নয়।

৩। কেবলা ব্যতীত পশুর মুখ অন্য দিকে করিয়ে জবাই করাও ঠিক নয়।

৪। মরার পূর্বে পশুর ঘাড়কে মোচড়ানো মাকরূহ (ঘৃণিত) কাজ। গরু ও ছাগলকে বাম দিকে কাত করে ফেলে যবেহ করা সুন্নাত। (আর উটের ব্যাপারে সুন্নাত হলো) দাঁড় করিয়ে ডান হাত বেঁধে জবাই করা।

শিকার করা

প্রয়োজনে শিকার করা জায়েয। তবে খেলাধুলার জন্য শিকার করা একটি অপছন্দনীয় কাজ। শিকার কৃত পশু-পাখির দু'টি অবস্থা হতে পারেঃ-

১। হয় তাকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যাবে, এমতাবস্থায় তাকে জবাই করা অত্যাবশ্যক।

২। কিংবা তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যাবে, অথবা জীবিত অবস্থায়, কিন্তু সে জীবন খুবই সাময়িক, এমতাবস্থায় সে পশু হালাল।

জবাইকারীর উপর আরোপিত শর্ত শিকারীর উপরেও অর্পিত হবে। যেমন-

১। জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম অথবা কিতাবী হওয়া। সুতরাং কোন পাগল, অথবা নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি, অথবা অগ্নিপূজক, কিংবা মূর্তিপূজক দ্বারা শিকার কৃত পশু মুসলমানদের জন্য খাওয়া বৈধ নয়।

২। অস্ত্র এমন ধারালো হতে হবে, যাতে রক্ত প্রবাহিত হয়। আর তা যেন নখ ও হাড়জাতীয় কোন কিছু না হয়। আর শিকার যেন অস্ত্রের ধারে আহত হয়, তার ভারীতে নয়।তবে শিকারী কুকুর ও পাখি, যাদের দিয়ে শিকার করা হয়, তারা যদি শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তাদের দ্বারা শিকার কৃত পশু হালাল। আর এদের শিক্ষা হলো, যখন শিকারের জন্য যেতে বলবে, তখনই যাবে। না বললে যাবে না। আর শিকার যখন ধরবে, তখন তার এই ধরা মালিকের জন্য হবে, নিজের জন্য নয়।

৩। অস্ত্র যেন শিকারের উদ্দেশ্যেই চালানো হয়। সুতরাং কোন অস্ত্র যদি হাত থেকে পড়ে কোন শিকার হত্যা করে ফেলে, তাহলে তা খাওয়া হালাল হবে না। কেননা তাতে শিকারের উদ্দেশ্য থাকছে না। অনুরূপ শিকারী

কুকুর যদি নিজেই গিয়ে কোন শিকার হত্যা করে ফেলে, তাহলে সেটাও হালাল হবে না। কারণ, তাকে তার মালিক শিকারের উদ্দেশ্যে পাঠাইনি। যদি কেউ শিকারকে নিশানা করে কোন কিছু চালায়, আর তা গিয়ে যদি অন্য কাউকে লাগে, অথবা একদল শিকার যদি তাতে মারা যায়, তাহলে সমস্ত শিকারই হালাল হবে।

৪। তীর ও শিকারী কুকুর ইত্যাদি পরিচালনা করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা। 'বিসমিল্লাহ' এর সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলাও সুন্নাত।

সাবধান! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যে তিনটি ব্যাপারে কুকুর পোষার অনুমতি দিয়েছেন, তা ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উদ্দেশ্যে তা পোষা হারাম। আর যে তিনটি কারণে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তা হলো, শিকারের উদ্দেশ্যে, অথবা গবাদিপশু, কিংবা চাষ ক্ষেতের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে।

أحكام العمرة

উমরার বিধান

উমরা প্রত্যেক মুসলমানের উপর জীবনে এক বারই ওয়াজিব হয়। যার প্রমাণ আল্লাহ তা'য়ালার বাণী। তিনি বলেন,

(وأتموا الحج والعمرة لله) البقرة ١٩٦

অর্থাৎ, খোদার সন্তোষ বিধানের জন্য যখন হজ্জ্ব ও উমরার নিয়ত করবে, তখন তা পূর্ণ করবে"। (সুরা বাকারাহ্‌ ১৯৬) উমরাহ একটি উত্তম কাজ যা সাধ্যানুযায়ী একাধিক করা মুস্তাহাব। উমরাকারীর সর্ব প্রথম কাজ হলো, ইহরাম বাঁধা।

ইহরামঃ উমরার কার্যসমূহের মধ্যে প্রবেশ করার নাম হলো ইহরাম। ইহরাম বাঁধার পর ঐ সমস্ত জিনিস মুহরিম তথা হজ্জ্ব ও উমরাকারীর উপর হারাম হয়ে যায়, যা ইতিপূর্বে তার জন্য হালাল ছিল। কারণ, সে একটি এবাদতের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আর ইহরাম বাঁধা তার উপর ওয়াজীব যে উমরার ইরাদা করবে।

মক্কা ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চল থেকে উমরার উদ্দেশ্যে আগমনকারীকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতৃক নির্ধারিত মিকাত সমূহের কোন এক মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে। আর তা হলো,

১। মদীনাবাসীদের জন্য "যুলহুলায়ফা" এটা মদীনার সন্নিকটে একটি ছোট জায়গা যাকে বর্তমানে "আব্‌য়ারে আলী" বলা হয়।

২। শামবাসীদের জন্য "আল-জোহফা" এটি রাবেগের একটি গ্রাম। বর্তমানে এখান থেকেই হাজীরা ইহরাম বাঁধে।

৩। নাজদবাসীদের জন্য "কারনুল মানাযেল" (আসসায়লুল কাবীর) এটি তায়েফের সন্নিকটে একটি স্থান।

৪। ইয়ামানবাসী ও (ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে আগমনকারী সকল হাজীদের) জন্য "ইয়ালাম লাম"। মক্কা থেকে ৭০ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত একটি স্থান।

৫। ইরাকবাসীদের জন্য " যাতে ইরক"।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত এই মিকাতসমূহ উপরোল্লেখিত তাদের জন্য এবং হজ্জ্ব ও উমরাহ আদায়ের উদ্দেশ্যে আগমনকারী সকলের জন্য। মক্কাবাসী ও আহলে হিল (মিকাত ও হারাম সীমানার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানকারী) মিকাত ও হারাম সীমানার নিকটতম কোন মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধবে। যেমন, তানয়ীম, জে'ইররানা ও আরাফা ইত্যাদি।

ইহরামের পূর্বে করণীয় সুন্নাতী বিষয়াদি

১। নখ কাটা, বগলের চুল পরিস্কার করা, মোচ কাটা, নাভির নিচের চুল পরিষ্কার করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা। তবে সুগন্ধী শরীরে ব্যবহার করবে, কাপড়ে নয়।

২। সিলাইবিহীন একটি লুঙ্গি ও চাদর ব্যবহার করা। মহিলারা পর্দা বজায় রেখে যে কোন কাপড় ব্যবহার করতে পারবে। তবে পর পুরুষের সামনে নিজের সৌন্দর্যের প্রদর্শনী ও হাত-মুখ খুলা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। হাত মোজা ও মুখাচ্ছাদন ব্যবহার করবে না।

৩। যদি নামাযের সময় হয়, তাহলে মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করা। অন্যথায় ওযুর সুন্নাতের নিয়ত করে দু'রাকআত নামায আদায় করা। অতঃপর উমরার নিয়ত করা। নিয়তের পদ্ধতি হলো, মুখে বলবে, " আল্লা-হুম্মা লাব্বায়কা উমরাতান"।

যদি উমরাকারী আকাশ পথে আগমনকারী হয়, তাহলে সে মিকাতের নিকটে অথবা তার কিছু পূর্বেই ইহরাম বেঁধে নেবে, যদি মিকাত নির্ণয় করতে অসুবিধা হয় এবং মিকাতে করনীয় যাবতীয় কাজ জাহাজে উঠার পূর্বেই, অথবা জাহাজে উঠে করবে। যেমন, নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, বগলের চুল পরিষ্কার করা ইত্যাদি। অতপরঃ মিকাতে পৌঁছার আগেই, অথবা সেখানে পৌঁছে নিয়ত করবে। নিয়ত করার পর থেকে নিয়ে তাওয়াফ আরম্ভ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সব সময় তালবীয়াহ পড়তে থাকবে। আর তালবীয়াহ হলো, (লাব্বায়কা আল্লা-হুম্মা লাব্বায়িক, লাব্বায়কা লা-শরীকা লাকা লাব্বায়িক, ইন্নালহামদা অন্নি'মাতা লাকা অলমুলকা লা-শরীকা লাক)

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ

১। মাথা ও শরীরের কোন অংশের চুল নষ্ট করা। তবে ধীরস্থিরভাবে মাথা চুলকানোতে কোন দোষ নেই।
২। নখ কাটা, তবে আপনা আপনিই কারো নখ নষ্ট হয়ে গেলে, অথবা অসুবিধার কারণে কাটতে হলে তাতে দোষ নেই।
৩। সুগন্ধি ও সুবাসযুক্ত সাবান ব্যবহার করা।
৪। স্ত্রী সঙ্গম ও তাতে উদ্বুদ্ধকারী জিনিস। যেমন, বিবাহ করা, নারীদের প্রতি যৌন কামনার সাথে দেখা, মহিলার শরীরের সাথে শরীরের স্পর্শ ও চুম্বন করা ইত্যাদি।
৫। হাত মোজা ব্যবহার করা।
৬। শিকার করা।

উপরোক্ত জিনিসগুলি পুরুষ ও মহিলা সকলের উপর হারাম। কিছু জিনিস এমন রয়েছে, যা শুধু পুরুষের উপর হারাম। যেমন,
(ক) সিলাইযুক্ত কাপড় ব্যবহার করা। তবে প্রয়োজনীয় জিনিস মুহরিম ব্যবহার করতে পারবে। যেমন, বেল্ট, ঘড়ি এবং চশমা।
(খ) কোন এমন জিনিষ দিয়ে মাথা ঢাকা যা মাথার সাথে একেবারে লেগে থাকে। এ ছাড়া যা মাথার সাথে লেগে থাকেনা, যেমন, ছাতা, গাড়ীর ছায়া ও তাঁবুর ছায়া ইত্যাদি গ্রহণ করতে দোষ নেই।
(গ) পায়ের মোজা ব্যবহার করা, তবে জুতা না পেলে চামড়ার মোজা ব্যবহার করতে পারে।

উপরোক্ত নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ যদি কারো দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায়, তার তিনটি কারণ হতে পারে। যেমন,
১। হয় সে জেনে-শুনে বিনা কোন কারণে তা করবে, এমতাবস্থায় সে গুনাহগার বিবেচিত হবে এবং তাকে ফিদয়া দিতে হবে।
২। কিংবা সে কোন কারণে করবে, এমতাবস্থায় সে গুনাহগার হবে না। তবে তাকে ফিদয়া দিতে হবে।
৩। কিংবা সে মূর্খতার কারণে, অথবা ভুলে, অথবা তাকে করতে বাধ্য করা হবে, এমতাবস্থায় না সে গুনাহগার হবে আর না তাকে ফিদয়া দিতে হবে।

ইহরামের পর উমরাকারী মসজিদে হারামের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করবে। মসজিদে হারামে পৌঁছে সুন্নাত অনুযায়ী ডান পা প্রথমে রাখবে এবং এই দোয়া পাঠ করতঃ প্রবেশ করবে (বিসমিল্লাহি অসসালাতু অসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি, আল্লা-হুম্মাগফিরলি যুনুবি অফতাহ লি আবওয়াবা রাহমাতিকা) অর্থঃ আমি আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি। আল্লাহর রাসূলের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষন হোক। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহসমূহকে মাফ করে দাও এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।

প্রত্যেক মসজিদে প্রবেশ করার সময় উক্ত দোয়া পড়তে হয়। অতঃপর তাওয়াফের উদ্দেশ্যে কা'বা অভিমুখে অগ্রসর হবে।

ইহরামের পর উমরাকারী মসজিদে হারামের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করবে। মসজিদে হারামে পৌঁছে সুন্নাত অনুযায়ী ডান পা প্রথমে রাখবে এবং এই দোয়া পাঠ করতঃ প্রবেশ করবে (বিসমিল্লাহি অসসালাতু অসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি, আল্লা-হুম্মাগফিরলি যুনুবি অফতাহ লি আবওয়াবা রাহমাতিকা) অর্থঃ আমি আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি। আল্লাহর রাসূলের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষন হোক। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহসমূহকে মাফ করে দাও এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।

প্রত্যেক মসজিদে প্রবেশ করার সময় উক্ত দোয়া পড়তে হয়। অতঃপর তাওয়াফের উদ্দেশ্যে কা'বা অভিমুখে অগ্রসর হবে।

তাওয়াফ

তাওয়াফ হলো, আল্লাহর এবাদতের উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফের সাত চক্কর প্রদক্ষিন করা। আর তাওয়াফ কা'বা কে বাঁয়ে রেখে হাজরে আসওয়াদ থেকে আরম্ভ হবে এবং সেখানেই শেষ হবে। ওযু অবস্থায় তাওয়াফ করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। তাওয়াফের নিয়ম হলো,

১। "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলে ডান হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করবে। আর সম্ভব হলে তাকে চুমা দেবে। হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেওয়া সম্ভব না হলে, হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করে হাতে চুমা দেবে। হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেওয়া ও স্পর্শ করা কোনটাই সম্ভব না হলে, তাকে সম্মুখ করে "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলে হাত দ্বারা তার দিকে ইশারা করবে। তবে হাতে চুমা দেবে না। অতঃপর কা'বাকে বাঁয়ে রেখে তাওয়াফ আরম্ভ করবে এবং সাধ্যানুসারে দোয়া ও কোরআন তেলাওয়াত ইচ্ছামত করতে থাকবে। উমরা- কারী আপন ভাষায় নিজের জন্য ও যার জন্য সে চাইবে, দোয়া করতে পারবে। তাওয়াফের জন্য কোন নির্দিষ্ট দোয়া নেই।

২। রুকনে ইয়ামনীর নিকটে পৌঁছে সম্ভব হলে, "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলে তাকে স্পর্শ করবে। তবে হাতে চুমা দেবে না। যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তার দিকে কোন ইশারা না করে তাওয়াফ অব্যাহত রাখবে এবং সেখানে তাকবীরও পড়বে না। হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামনীর মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছে এই আয়াতটি পড়বে "রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাউ অ ফিল আখিরাতি হাসানাতাউ অ ক্বিনা আযাবান্নার"। অর্থাৎ, হে আমাদের খোদা! আমাদিগকে এই দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান করো এবং পরকালেও আমাদিগকে কল্যাণ দাও। আর আগুনের আযাব হতে আমাদিগকে রক্ষা করো।

৩। হাজরে আসওয়াদের নিকটে পৌঁছে সম্ভব হলে হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করবে কিন্তু সম্ভব না হলে, "আল্লাহু আকবার" বলে হাত উঠিয়ে তার দিকে ইশারা করবে। এই ভাবে সাতটি তাওয়াফের মধ্যে একটি তাওয়াফ সুসম্পন্ন হবে।

৪। প্রথম তাওয়াফের ন্যায় অন্যান্য তাওয়াফগুলিও সুসম্পন্ন করবে। প্রথম তাওয়াফে যাবতীয় করনীয় বাকী সমস্ত তাওয়াফে অনুরূপ করবে। যখনই হাজরে আসওয়াদের নিকটে আসবে তাকবীর পড়বে। প্রথম তাওয়াফের তিনটি চক্করে রামল করবে। অবশিষ্ট চারটি চক্করে হাঁটবে। আর রামল হলো, ছোট ছোট কদমে বা পদক্ষেপে দ্রুত চলা। পুরা সাত চক্করের এই প্রথম তাওয়াফে ইযতিবা করাও সুন্নাত। আর ইযতিবা হলো, পরিহিত চাদরের মধ্যভাগকে ডান কাঁধের নীচে দিয়ে চাদরের উভয় কোণ বাম কাঁধের উপর ধারণ করা। হজ্জ ও উমরাহকারী সর্ব প্রথম যে তাওয়াফ করবে, সেই তাওয়াফেই শুধু রামল ও ইযতিবা হবে।

তাওয়াফের পরঃ তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকআত নামায আদায় করা সুন্নাত। মাকামে ইবরাহীম তার ও কা'বার মধ্যস্থলে থাকবে। প্রথম রাকআতে সূরা ফাতেহা সহ 'কুল ইয়া আয়্যোহাল

কাফেরুন' পড়বে। আর দ্বিতীয় রাকআতে সূরা "ফাতেহা" সহ "কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ" পড়বে। অত্যধিক ভীড়ের কারণে যদি মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়া সম্ভব না হয়,তাহলে মসজিদের যে কোন স্থানে পড়ে নেবে। তাওয়াফ ও নামাযের পর খুব বেশী বেশী যমযমের পানি পান করা সুন্নাত।

সা'য়ীঃ যমযমের পানি পান করে সাফা-মারওয়ার অভিমুখে যাত্রা করবে। সাফায় পৌঁছে এই আয়াতটি পড়বে "ইন্নাসসাফা অল মারওয়াতা মিন শাআ'য়িরিল্লা-হ" অতঃপর সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে কেবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও ইচ্ছামত দোয়া করবে। যেমন এই দোয়াটি করা " লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহ আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়ুহয়ী অ য়ুমীতু অহুয়া আলা কুল্লি শায়িন ক্বাদীর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু আনজাযা ওয়া'দাহু অ নাসারা আবদাহু অ হাযামাল আহযাবা অহাদাহু"অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই তিনি মহান। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই তিনি এক ও একক তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যুদান করেন এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাশীল। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই তিনি এক ও একক। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেছেন , তাঁর বান্দার সহযোগিতা করেছেন এবং সৈন্যদেরকে তিনিই পরাজিত করেছেন। উক্ত দোয়াটি তিনবার পড়বে এবং অনেকক্ষণ ধরে দোয়া করবে।

দোয়া শেষ করে সাফা পাহাড় থেকে অবতরণ করতঃ মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হবে। যখন সবুজ বাতির নিকটে পৌঁছবে, তখন সাধ্যানুসারে দ্বিতীয় সবুজ বাতি পর্যন্ত দৌড়বে । তবে দৌড়তে গিয়ে কারো কষ্ট যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর দৌড় শুধু পুরুষদের জন্য মহিলাদের জন্য নয়। মারওয়ায় পৌঁছে কেবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে ঐ সমস্ত দোয়া পাঠ করবে যা সাফা পাহাড়ে করেছে। এই ভাবে সাত চক্করের এক চক্কর পূরণ হবে। দোয়ার পর মারওয়া থেকে অবতরণ করে সাফার দিকে অগ্রসর হবে এবং প্রথম চক্করে যাবতীয় করণীয় অন্যান্য সমস্ত চক্করেও করবে। সা'য়ী করাকালীন বেশী বেশী দোয়া করা সুন্নাত।

সা'য়ী শেষ হয়ে গেলে উমরাকারী চুল নেড়া করে অথবা খাটো করে হালাল হতে পারবে। তবে চুল নেড়া করা উত্তম।

উমরার আরকান

১। ইহরাম বাঁধা।

২। কা'বা শরীফের তাওয়াফ করা।

৩। সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করা।

যদি কেউ উমরার রুকনসমূহের কোন রুকন ছেড়ে দেয়, তাহলে তার উমরাহ হবে না। তাকে পুনরায় উমরাহ করতে হবে।

উমরার ওয়াজিবসমূহ

১। মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধা।

২। মাথা নেড়া করা অথবা চুল খাটো করা ।

যদি কেউ উমরার ওয়াজিবসমূহের কোন কিছু ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকে একটি ছাগল কিংবা দুম্বা যবেহ করতে হবে, যা হারাম শরীফের ফকির-মিসকিনদের উপর বন্টন হবে।